জীবন নৌকার মাঝি

- শামসুদ্দোহা

বর্ষা মরসুমে আমাদের এলাকার পানির অবস্থা দেখে মনে হবে প্রকৃতির অফুরন্ত দান যা অকৃপণভাবে বিলিয়ে দিয়েছে। দৃষ্টি যতোদূর যায় শুধু পানি আর পানি। নৌকা এখানকার জীবন নির্বাহের নিত্যসঙ্গী। মালপত্র থেকে শুরু করে যাতায়াত, পারাপার, মাছ ধরাসহ বিকেলের বিনোদন হলো একমাত্র নৌকা।

২০০০ সালে ইউনিভার্সিটির গণ্ডি পেরিয়ে আমাদের থানা সদরের ডিগ্রি কলেজে যোগ দিলাম। বাড়িতে যাতায়াতের মাধ্যম ছিল নৌকা। অথৈ পানির টিলায় আমার জন্ম হলেও জীবনের পাট চুকিয়েছি উচু ভূমি কুষ্টিয়াতে। তাই বিকেলের নৌকা ভ্রমণটা আমার ভালো লাগতো।

২০০১-০২ সালের বর্ষা মরসুমের শ্রাবণ মাস। শুক্রবারের ছুটির বিকেলে ছোট নৌকাখানা নিয়ে ধীর, অতি ধীরে বৈঠা মেরে এগিয়ে যেতাম শাপলা ঘেরা বিলে। মনোরম দৃশ্য আমার অন্তরে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে কেউ থাকলে যে উপভোগ বেশি হতো তাতে সন্দেহ নেই। কখন যে, চলতে চলতে বিলের মাঝে টিলার কাছে চলে গেছি যেখানে বিকেলের লঞ্চ ভিড়ে।

এই অবস্থায় টিলা থেকে ভেসে এলো মেয়েলি কণ্ঠ, এই ছেলে, শোনো।

ভাবলাম, অন্য কাউকে ডাকা হচ্ছে। হাতের ইশারায় আমাকেই ডাকা হচ্ছে। টিলার পাশে রেখে নৌকা দেখলাম বিশ বাইশ বছরের এক তরুণী। সঙ্গে দশ বারো বছরের একটি ছেলে।

ছেলেটি কাদছে।

বললাম, ছেলেটি কাদে কেন?

মেয়েটি বললো, আমরা ঢাকা থেকে এসেছি। যাবো নিলটুলিতে, অথচ এখানে এসে বুঝতে পারছি কতো বড় বিপদে পড়ে গেছি। তুমি আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করো। বিনিময়ে যা চাও, দেবো।

বললাম, ম্যাডাম, বিপদের সময় সবাই এ কথাই বলে। বিপদ গেলে খেয়াঘাটের মাঝি, মাঝিই থেকে যায়।

একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, নিলটুলি আমার গ্রামের ঠিক উল্টোদিকে। যদি তাদের পৌছে দেই, আমাকে আট নয় কিলোমিটার বৈঠা মারতে হবে যা আমার জন্য বড় কঠিন ব্যাপার। অন্যদিকে এই অথৈ পানির টিলায় একটা বালক ও তরুণীকে রেখে যাবো, তা কি হয়!

যখন এসব চিন্তা করছি, এমন সময় মেয়েটি বললো, টাকার ব্যাপারে চিন্তা করো না। যা চাও, তুমি পাবে, বকশিশও পাবে। কারণ নিলটুলির শওকত মহাজন আমার নানা।

মনে মনে বললাম, ম্যাডাম, আপনাদের বুঝি অনেক টাকা? আমি আপনাদের পৌছে দেবো কি না সেটা না জেনে আপনি টাকার বড়াই করে যাচ্ছেন। কিন্তু মানবিক কারণে মুখে বললাম, নৌকায় ওঠেন।

নৌকা চালনায় অভ্যাস না থাকলে বেশি সময় নৌকা চালানো যায় না। তার মধ্যে মেয়েটি কখনো কলমি ফুল আবার কখনো শাপলা ফুল ধরে টান দিচ্ছিল। এতে নৌকা ঘুরে যাচ্ছিল।

বললাম, ম্যাডাম, আর কিছু ধরাধরি করবেন না, আমার কষ্ট হচ্ছে।

মেয়েটি কি না বলে, কষ্ট তো তুমি ফৃ করছো না। তোমাকে তো মজুরি দেয়া হবে। তাছাড়া শাপলা ধরার মজা তুমি বুঝবে কি করে!

মনে মনে ভাবলাম, মেয়েকে কাবু করতে হবে অন্যভাবে। বললাম, ম্যাডাম, দুনিয়ায় এতো ফুল থাকতে জাতীয় ফুল কেন শাপলা হলো?

না পেরে সে বললো, তুমি গ্রামের মানুষ, তোমার তা জেনে দরকার কি?

শাপলা তো গ্রামেই ফোটে। তাই জিজ্ঞাসা করলাম। জানি, উত্তর দিতে আপনি পারবেন না। কারণ গোলাপ, রজনীগন্ধা হলো আপনাদের পছন্দের ফুল। গ্রামের মানুষদের ফুল শাপলা। শাপলা আমাদের সঙ্গে মিশে আছে আত্মিকভাবে। আদর বা শ্রম কোনোটাই সে চায় না। সে শুধু দিয়েই যাচ্ছে। আপনি কে বা কি করেন জানি না। শুধু এতোটুকু বলবো যে, জীবনে শাপলা ফুলের মতো নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা করবেন। আপনার কাছ থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি। তাছাড়া গ্রামের কৃষকের ঘাম ঝরানো ফসল খেয়ে আপনি আমাকে তুচ্ছ করছেন। আমি শুধু জন্মেছি পরিশ্রম করার জন্য।

তুমি এতো সুন্দর করে কথা বলতে পারো?

কেন, আপনার কি ধারণা, গ্রামের লোক ঠিক মতো কথা বলতে পারে না?

এমন সময়ে পাশ দিয়ে যাওয়া পরিচিত এক নৌকা সওয়ারি আমাকে বললো, মেজদা, কবে বিয়ে করলে? আমাদের নিমন্ত্রণ না হয় না দিলে, জানতেও কি পারবো না?

লজ্জায় শুধু বললাম, পরে কথা বলবো। তুই বাড়িতে গিয়ে বলিস আমার ফিরতে দেরি হবে।

এই পরিস্থিতিতে ম্যাডামের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। শুধু শুনলাম বলতে, *যতো সব ইতরের দল*।

ইতিমধ্যে নিলটুলির মধ্যে এসে গেছি। ম্যাডাম, আপনারা এই রাস্তায় নেমে হেটে গেলে দশ মিনিটের রাস্তা।

ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে উঠিয়ে দুজন নেমে পড়লো। আমাকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও, খুচরা থাকলে আরো দুই চার টাকা বেশি দিতাম।

ধন্যবাদ ম্যাডাম, খুচরা শুধু নয়, নোটের টাকাটাও আপনি নিয়ে যান।

ঠিক আছে তোমাকে একশ টাকাই দিচ্ছি।

তাও নেবো না। বলে নৌকা বাড়ির দিকে চালালাম। বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হলো।

পরের দিন ভোরে বাড়ির কাজে ছেলে মফিজ একটা ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে দিয়ে বললো, এটা নৌকার তলায় পাওয়া গিয়েছে।

ভেবেছিলাম ঘটনা শেষ হয়েছে।

এখন দেখি শেষ না, শুরু।

পরের দিন মফিজকে ব্যাগ দিয়ে পাঠালাম নিলটুলিতে।

শওকত মহাজন ব্যাগ পেয়ে সুমিকে দিয়ে বললেন সব ঠিক আছে কি না দেখতে।

সব ঠিক আছে দেখে মফিজকে পুরস্কার দিতে চাইলো সুমি। মফিজ টাকা নিল না।

সুমি ভাবলো, সেদিনকার ছেলেটিও টাকা নিল না। তাই মফিজকে বললো, গতকাল যে ছেলেটি আমাকে পার করেছিল সে এলো না কেন?

মফিজ বললো, কলেজে গেছেন।

কোন কলেজে পড়ে?

মফিজ বললো, ম্যাডাম, পড়ে না, পড়ায়।

সুমির টনক নড়লো। বলে কি? মফিজের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে সুমি পরের দিন কলেজে এসে উপস্থিত।

কমপিউটারে কাজ করছি, এমন সময় পিয়ন এসে বললো, স্যার, আপনার গেস্ট।

বললাম, বসতে বলো, হাতের কাজ সেরে আসছি।

নিচে নেমে গেস্ট খুজছি। এমন সময় পেছন থেকে আওয়াজ এলো, জি, আমি।

আরে আপনি? কি ব্যাপার? এখানে?

জি, আপনার কাছে এসেছি।

কোথাও কি আবার পৌছে দিতে হবে।

বললো, সেদিনকার জন্য এখনো কষ্ট পাচ্ছেন?

বললাম, না, আমি তো আমার কর্তব্য পালন করেছিলাম।

শুনেছি বৈঠা চালাতে আপনার হাতে ফোসকা পড়ে গেছে।

নৌকা চালাতে অভ্যাস না থাকায় পড়েছে।

বললো, দাড়িয়ে কথা বলবো স্যার? বসতে বলবেন না?

আরে তা হবে কেন? চলুন বসি।

না, না। এখানে বসবো না। চলুন বাসাতে যাই।

দুজন বাসাতে গেলাম হাটতে হাটতে। ইতিমধ্যে সুমি পরিচয় দিল। সে অর্থনীতিতে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে।

আপনার সরলতা আমার ভালো লেগেছে। তাই ভণিতা না করে সরাসরি চলে এসেছি। কিছু মনে করেননি তো?

আরে না না, মনে করার কি আছে, শুধু...।

শুধু কি?

প্রথম আমাকে *তুমি* করে বলতেন। এখন *আপনি* বলছেন?

সুমি হেসে বললো, সেদিন পার করতে তুমি যা অভিনয় করলে, বুঝতেই পারিনি তুমি কলেজে পড়াও। তাছাড়া গেঞ্জি গায়ে তোমাকে ছেলে ছেলে লাগে।

হোটেল থেকে খাবার আনালাম।

সুমি যত্ন করে আমাকে খাওয়ালো।

বুঝলাম একাকী জীবন কোনো জীবনই না। তাই বললাম, সুমি, তুমি কেন এতো কষ্ট করে এলে?

বোঝোনি কেন এসেছি? তুমি শুধু নৌকার মাঝিই নও, তুমি যে আমার জীবন নৌকার মাঝি। আমি তোমার নৌকায় চড়তে এসেছি। আমাকে না বলবে না।

বললাম, সুমি, উত্তাল সমুদ্রে নৌকায় হিসাব করে চড়তে হয়।

এই থেকে আমাদের দুজনার মাঝে একটা চমৎকার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুমি ঢাকা থাকলেও মনে হতো দুজন আছি দুজনার। ভেবেছিলাম পড়ালেখা শেষ পর্যায়ে গেলে দুজন হয়ে যাবো।

মানুষের মন বড়ই বিচিত্র! সুমি এখন অন্যের ঘরের বৌ। হয়তো অন্য কোনো সুমির খোজে জীবন নদীর নৌকা আমি একাই বয়ে চলেছি।

গোপালগঞ্জ থেকে

রুমিআপা

– সৈয়দ তারেক মাহমুদ শিমুল

নৌপথ ভ্রমণ নিয়ে লিখতে বসে প্রথমেই যার কথা মনে পড়লো তিনি হচ্ছেন আমার রুমিআপা। রুমিআপা সম্পর্কে আমার চাচাতো বোন। তিনি নদীতে সাতার কাটতে, নৌকায় চড়তে পছন্দ করতেন।

আমার বয়স তখন আট নয় বছর হবে। বর্ষাকালে আমাদের বাড়ির চারদিকে পানিতে থৈ থৈ করতো। সেই পানিতে থাকতো শাপলা-শালুকের ছড়াছড়ি।

রুমিআপা একদিন প্রস্তাব করলেন, চল দুজনে বিলে গিয়ে শাপলা তুলে আনি।

তার এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম।

দুজনে কলার ভেলায় চড়ে বিলের দিকে চললাম। আমি আট দশ হাত লম্বা একটি বাশ দিয়ে ভেলা চালাচ্ছি এবং রুমিআপা গুন গুন করে গান গাইছেন ও শাপলা তুলছেন। সে এক চমৎকার অনুভূতি।

এভাবে শাপলা তুলতে আমরা গভীর পানির দিকে এগিয়ে চলেছি। এক সময় লক্ষ্য করলাম আমার হাতের বাশটি আর মাটিতে ঠেকছে না। আমরা পড়ে গেলাম ভীষণ বিপদে। ভয়ে আমার আত্মা কেপে উঠলো। কারণ সাতার জানি না। ভেলাকে যতো কম পানিতে আনার চেষ্টা করছি ভেলা ততোই যেন বেশি পানিতে চলে যাচ্ছে।

রুমিআপাও হাত দিয়ে বেয়ে ভেলাকে কম পানিতে আনার চেষ্টা করছেন।

এভাবে চেষ্টা করতে করতে এক সময় পা পিছলে পানিতে পড়ে গেলাম। আগেই বলেছি, সাতার জানি না। তাই পানিতে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকি।

রুমিআপা সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ঝাপিয়ে পড়েন এবং আমাকে ভেলার ওপর তুলে নেন।

দুজনের চেষ্টায় এক সময় আমরা বাড়ি পৌছাতে সক্ষম হই।

সেদিন রুমিআপাই আমার জীবন বাচিয়েছিলেন।

রুমিআপার চেহারা মোটামুটি ভালো হলেও গায়ের রঙ কালো। তিনি ছাত্রী হিসেবে খুবই ভালো ছিলেন। রান্না-বান্না, সেলাই ইত্যাদি কাজেও খুব দক্ষ ছিলেন। এক কথায় গুণী মেয়ে। এই গুণী মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল না। কারণ তার গায়ের রঙ কালো। মেয়েকে নিয়ে তার বাবা মায়ের চিন্তার শেষ ছিল না। তারও মন সব সময় খারাপ থাকতো।

মনে মনে আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম, তুমি রুমিআপার গায়ের রঙ ফর্শা করে দাও।

একবার মাটির ব্যাংক ভেঙে দেখলাম বিশ টাকা জমা হয়েছে। সেই বিশ টাকা দিয়ে রুমিআপার জন্য রঙ ফর্শা করার *কৃম ফেয়ার এন্ড লাভলী* কিনলাম।

যেদিন সেই কৃম তাকে দিলাম, তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে কেদে ফেললেন এবং বললেন, দুর বোকা! কৃমে কি রঙ ফর্শা হয়! অযথাই তুই তোর ব্যাংকের জমানো টাকা নষ্ট করলি।

তিনি শেষ পর্যন্ত আমার কেনা কৃম মাখেন। কিন্তু তার গায়ের রঙয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। এদিকে একের পর এক পাত্রপক্ষ এসে তাকে দেখে পোলাও-কোরমা খেয়ে মেয়ে পছন্দ হয়নি বলে চলে যায়। তার ছোট বোন সুমির জন্য অনেক আগে থেকেই ডাক্তার পাত্র ঠিক হয়ে আছে। কারণ সুমি সুন্দরী।

বাবা-মা পড়ে যান মহা বিপদে। একদিকে যেমন ডাক্তার পাত্র হাত ছাড়া করতে চান না, অন্যদিকে বড় মেয়ে রেখে ছোট মেয়ের বিয়ে দিতে চান না।

সবাই রুমিআপার দিকে এমনভাবে তাকান যে তার গায়ের রঙ কালো হওয়ার জন্য তিনিই দায়ী।

এমন যখন পরিস্থিতি তখন একদিন সকালে উঠে শুনলাম রুমিআপাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। সারা গ্রামের মানুষ খোজাখুজি করার পর রুমিআপার লাশ পাওয়া গেল। এবং লাশটা বিলের সেই জায়গায় পাওয়া গেল যেখানে শাপলা তুলতে গিয়ে আমি পা পিছলে পানিতে পড়ে গিয়েছিলাম। রুমিআপার বোনের যাতে বিয়ে হয় সে জন্যই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

রুমিআপা একদিন আমার জীবন বাচিয়েছিলেন। অথচ আমি পারিনি তাকে বাচাতে। আজ অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে রুমিআপাকে স্মরণ করছি।

মেহের চন্দ্রী, রাজশাহী থেকে

ব্যানানা আইল্যান্ড

- কবির

আমি একজন সামরিক কর্মকর্তা। তাই চাকরির সুবাদে আমাকে যেতে হয়েছিল সুদূর আফ্রিকার একটি দেশ সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে। সেখানে গিয়ে নতুন দেশ, নতুন জাতি দেখে তো প্রথমে হতবাক!

যাহোক, কিছু দিন গেলে কিছুটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেলাম! আটলান্টিক মহাসাগরে ঘেরা দেশটি বহু প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। আয়তনে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক। তবে লোকসংখ্যা মাত্র সত্তর লাখ।

যাহোক, আমাদের ক্যাম্প ছিল আটলান্টিক সাগরের তীর ঘেষে যেখান থেকে আমার আকাশপথে, স্থলপথে ও জলপথে সফল অভিযান চালাতে পারতাম।

কিছু দিন যাওয়ার পরে আমাদের কাজের একঘেয়েমি দূর করার জন্য ঠিক করলাম বেড়াতে যাবো। কিন্তু কোথায়? তারপর ঠিক হলো ওই দেশের একটি দ্বীপ আছে যা সমুদ্র উপকূল থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার ভেতরে। সেখানে বেড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও অনুমতি সংগ্রহ করে আমরা পনেরোজন মিলে একটি ছোট লঞ্চ ভাড়া করলাম। সে ভাড়া নেবে সাতশ ডলার।

নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের লঞ্চ ছাড়লো। যাত্রার পর খুব গর্ববোধ করলাম। পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর মহাসাগরে পাড়ি জমিয়েছি। কিছু দূর যেতেই দেখতে পেলাম বড় বড় মাছ আমাদের লঞ্চের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি মাছ তা আমাদের গাইডের কাছে জানতে পারলাম, সেগুলো তেলাপিয়া মাছ। তারপর মনে পড়লো যে, স্কুল জীবনে বইতে পড়েছি তেলাপিয়ার জন্ম আফ্রিকায়।

আরো কিছু দূর যেতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল। যার নাম *ব্যানানা আইল্যান্ড*। মনে মনে খুশির বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। তার মধ্যে সাগরের দিকে তাকালে মনে হতো সাগরের পানি বিভিন্ন রঙয়ের। মেঘের ছায়া পড়ে এ রকম মনে হচ্ছিল। আকাশটাকে মনে হলো আটলান্টিক সাগরে মিশে গেছে।

তারপর সেই দ্বীপে গিয়ে পৌছালাম। সেখানে গিয়ে আরেক দফা সমস্যায় পড়লাম। পুলিশ আমাদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিচ্ছিল না। যদিও আমাদের প্রয়োজনীয় কাগজ ছিল। তারপর তাদের কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে অনুমতি দিল।

পুরো দ্বীপটি ঘুরে দেখলাম আমরা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশটিতে জনসংখ্যার প্রায় পচিশ শতাংশ এইচআইভি এইডস রোগের জীবাণু বহন করে। যারা এই রোগে আক্রান্ত হয় সরকারি ব্যবস্থাপনায় তাদের এই দ্বীপে পাঠানো হয়। তাদেরকে দেশের মূল ভূখণ্ডে ফিরিয়ে আনা হয় না। সেখানে তাদের জন্য অনাথ আশ্রমের মতো সকল বন্দোবস্ত আছে।

তারপর এই একই লঞ্চে করে আবার ফিরে এলাম আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে নিজের কর্মস্থলে। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে আজ দেশে ফিরে এসেছি। কিন্তু আজও ভুলতে পারিনি সেই ব্যানানা আইল্যান্ড ভ্রমণের কথা।

টাঙ্গাইল থেকে

প্রতিমা বিসর্জন

– মোহাম্মদ আনছার আলী

আবু ধাবির একটা লেবার ক্যাম্প। সারি সারি দোচালা টিনের ঘর। ঠিক আমাদের দেশের সরকারি প্রাথমিক স্কুল ঘরগুলোর মতো। এগুলোতে সাধারণ শ্রমিকদের গাদাগাদি করে থাকার ব্যবস্থা। তবে আমরা যারা প্রকৌশলী তাদের জন্য কাঠের ছোট কুঠুরির একক রুমের বাসস্থান। সুপারভাইজারদের জন্য একই রকম ঘর

হলেও তাদের দুজনকে একঘরে বাস করতে হয়। সারাটা সপ্তাহ এ ক্যাম্পগুলো ঝিমুনির মধ্যে কাটলেও বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যা থেকে এগুলোতে প্রাণের সঞ্চার হয়।

গত ছয় দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে একদিনের ছুটি। অখণ্ড অবসর। তাই বিকেল থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে বন্ধু-বান্ধবদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। বিদেশ-বিভূইয়ে বন্ধু-বান্ধবের সংজ্ঞা একটু আলাদা। রুচি, বয়স, শিক্ষার অদৃশ্য সীমারেখা পেরিয়েও বহু সম্পর্ক হতে দেখা যায়। দেশে যা বোধ করি প্রায় অসম্ভব।

বরাবরই আমার বন্ধু ভাগ্য বেশ ভালো। আরব আমিরাতের এই মরু প্রান্তরেও আমরা কিছু পুরনো বন্ধ পুনঃমিলিত হয়েছি। এদের মধ্যে কয়েকজন রাজশাহী প্রকৌশল ইউনিভার্সিটি (সাবেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের) আর কয়েকজন পুরনো সহকর্মী এক সঙ্গে বাংলাদেশ কেমিকাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পরেশনের বিভিন্ন কারখানায় কাজ করতাম। বিদেশ-বিভূইয়ে এই পুরনো মুখগুলো এবং তাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের ছোয়া মরুভূমিতেও প্রাণের সঞ্চার করেছে। সপ্তাহান্তের অবসরগুলো প্রাণবন্ত আড্ডায় ভরে তুলি।

গত সপ্তাহে তেমনি এক জম্পেশ আড্ডা বসেছিল আমার ঘরে। আরব আমিরাতের আরেকটা শিল্প শহর আল-আইন থেকে এসেছিল গাজীউল, কায়কোবাদ। দুবাই থেকে নাজমুল আর রাশীদ ঢালী। গড় আয়ের তুলনায় আমিরাতে খাবার বেশ শস্তা। তারচেয়ে বেশি শস্তা সিগারেট। এখানে দামি সব ব্র্যান্ডের সিগারেট আমদানি হয় কোনো প্রকার কর আরোপ ছাড়াই। তাই এগুলোর খুচরা বিক্রয় মূল্য খুবই কম। কিন্তু অমুসলিম ও ডাক্তারি ব্যবস্থাপত্র ছাড়া অন্য কারো মদ কেনা, পরিবহন ও পান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে হ্যা, ভ্রমণ শিল্পকে চাঙ্গা রাখতে হোটেলগুলোতে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে।

যাক যা বলছিলাম। অঢেল খানা-পিনার পরে আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম। আমাদর আলাপ-আলোচনার কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারিত ছিল না। বার বারই আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছিল বাংলাদেশ এবং রাজনীতি। তাছাড়া দেশীয় আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি যে এর মধ্যে ঘুরে-ফিরে এসেছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পরবাসে এসেও আমাদের খারাপ কিছু অভ্যাস লক্ষ্য করছি। বাংলাদেশি আমরা প্রায়ই জাতীয় রাজনীতি নিয়ে অতিমাত্রায় আবেগের পরিচয় দিই যেটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। বিদেশে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ গঠনেও আমাদের কাছে রাজনৈতিক পরিচয়টাই মুখ্য হয়ে ওঠে যা বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট ও সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থহানি ঘটাচ্ছে। সৌভাগ্য যে, আমরা বন্ধুরা সবাই অতি আবেগীদের দলভুক্ত না হওয়ায় আমাদের আড্ডা সব সময়ই বেশ উপভোগ্য হয়।

এই যেমন নাজমুল সিগারেটে সুখটানটা দিয়ে বললো সজল, দোস্ত একটা গান শোনা।

আর সবাই তার কথায় সায় দিয়ে আমার না করার পথটাকে বন্ধ করে দিল।

আমি কোনো গায়ক নই বটে তবে মনটাকে হালকা করতে মাঝে মধ্যে হেড়ে গলায় গেয়ে থাকি।

সবার অনুরোধকে উপেক্ষা করতে না পেরে ধরলাম -

তুমি আর একবার আসিয়া

যাও মোরে কান্দাইয়া

আমি মনের সুখে আর একবার কান্দতে চাই।

আমার ধারণা, যন্ত্রের সঙ্গত ছাড়া মুখোমুখি গান পরিবেশন মানুষকে অধিকতর স্পর্শ করে। আমার গান শেষ হতে দেখি, ঘরে পিনপতন নীরবতা। শুধু সবার আপত্তি সত্ত্বেও নাজমুলের সুখটানের ধোয়ার কুণ্ডলিটা ঘরে মানুষের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে।

নাজমুলের কথায় আমরা সবাই বাস্তবতায় ফিরে এলাম।

শালা, আমি না হয় বৌ-ছাওয়াল ছাইড়া আইছি। তুই কান্দিশ ক্যান?

মজার ব্যাপার, হুজুগে নাজমুল ফর্মে থাকলে ফরিদপুর আর ঢাকাইয়া ভাষার অদ্ভুত মিশ্রণে কথা বলে। আমিও ছোট থেকেই কম হুজুগে নই। কিন্তু সরাসরি আক্রমণ আর চোখে পানির উপস্থিতিতে কিছুটা বিব্রত বোধ করতে থাকলাম। তবে নাজমুলের খোচাটা আমাকে আড্ডার বর্তমান ধারায় ফিরিয়ে আনতে তো পারলোই না, বরং হারিয়ে গেলাম স্মৃতির গহীন অরণ্যে।

আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। পত্নীতলা থানা সদর নজিপুর পাইলট হাই স্কুলে পড়ি। হুল্লুড়ে হলেও ভালো ছাত্র হবার কারণে কেউ ফালতু বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। তখন পলাশ ফোটার সময়। বাংলাদেশের অন্য দশটা স্কুলের মতো আমাদের স্কুলেও লাউডস্পিকারে গান আর ঢোলের সমাবেশে বিদ্যাদেবীর পূজা শেষ হয়েছে। বলতে গেলে আত্রাই নদী রক্ষা বাধের ঠিক উপরেই আমাদের স্কুল। তাছাড়া কিছুটা উজানে বিরাটকায় ব-দ্বীপ আকৃতির চরটা নদীর স্রোতধারাকে দুই ভাগ করছে। এবং সিংহ ভাগটা আবার আমাদের স্কুল ঘেষে প্রবাহিত হবার ফলে বাধের ধারেই গভীরতা খুব বেশি। স্থানীয় ভাষায় যাকে *দহ* বলে। বসন্তের প্রারম্ভে তাই স্বরস্বতী পূজার প্রতিমা বিসর্জন পালাটা আমরা স্কুলে বসেই দেখতে পারি। কলেজ, গার্লস স্কুল আর হাই স্কুলসহ প্রায় আট দশটি প্রতিমা বিসর্জন পর্ব আমাদের স্কুলের পেছনে এসেই শেষ হয়।

হিন্দু ধর্মাবলীরা বোধ করি আমার সঙ্গে একমত হবেন। পূজার আরতিটা যদি প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হয় তবে প্রতিমা বিসর্জনটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিসর্জনের আগে নৌকায় করে বিস্তীর্ণ এলাকা প্রতিমাসহ ভ্রমণ করা হয়, সঙ্গে ঢাকঢোল বাজে। উঠতি ছেলেমেয়েরা মাটির ধূপদানি হাতে মোহনীয় ভঙ্গিমায় নাচে। এ রকম এক বিসর্জন পর্বের দর্শক ছিলাম আমি। গার্লস স্কুলের মেয়েরা প্রতিমা বিসর্জনের জন্য নৌকায় করে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে আমাদের স্কুলের পেছনে এসেছে। শেষ অংকের শেষ দৃশ্যের কারণেই বুঝিবা মেয়েদেরকে নাচের উন্মাদনায় পেয়ে বসেছে। দর্শক সারি থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গানের কলি ছুড়ে দিলাম –

নাচো গো অঞ্জনা,
নাচো গো খঞ্জনা,
নাচো কোমর দোলাইয়া।

সঙ্গে আমাদের হাততালি মেয়েদের কিছুটা রাগান্বিত করে থাকবে। তারা সরাসরি প্রতিক্রিয়া না জানালেও আমাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নাচের লয় দ্রুত থেকে দ্রুততর করলো। আমরা নিরন্তর বাজনা আর নাচের জন্য কি না, কিছুটা অন্যমনস্ক। হঠাৎ ছলাৎ শব্দের সঙ্গে চিৎকার, চেচামেচিতে ধাতস্থ হলাম। দেখি মাটির প্রতিমার সঙ্গে জীবন্ত প্রতিমাও নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। একে গভীরতা, তারপরে শাড়ি পরা থাকায়, মেয়েটি পানিতে দাপাদাপি করে তলিয়ে যেতে থাকলো। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কিছুটা সংবিৎ ফিরতেই নদীতে ঝাপিয়ে পড়লাম। নদীতে সাতার আমার জন্য নিত্যদিনের ব্যাপার। কেননা দৈনন্দিন গোসল পর্বটা নদীতেই সেরে থাকি। কিন্তু তলিয়ে যেতে থাকা কোনো মানুষ, বিশেষ করে যে সাতার জানে না বা কোনো কারণবশত সাতার কাটতে পারে না তাকে ডুবন্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করা যে কি তা শুধু ভুক্তভোগীরাই জানে। কেননা সাতার না জানা বা কোনো কারণে সাতার কাটতে না পারা ব্যক্তির কাছাকাছি এলে সে এমনভাবে উদ্ধারকারীকে জাপটে ধরে যে, প্রায়ই উভয়ের সলিল সমাধি ঘটে। আমার বেলায় তা না ঘটলেও নৌকার মাঝিদের সহায়তায় মেয়েটিকে নিয়ে যখন ডাঙায় উঠলাম ততোক্ষণে আমার প্রায় জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা। তাছাড়া নদীর পানিতে পেট ঢোলের আকার নিয়েছে। আমার জীবনপঞ্জিতে নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ ঘটনা হলেও এতো দিনে তা আমার মনে থাকতো কি না সন্দেহ যদি আরেক নৌকা উপাখ্যানের ব্যর্থ নায়ক আমি না হতাম।

তারপরে আত্রাই নদীতে অনেক জল গড়িয়েছে। আমিও এসএসসি এবং এইচএসসি-র চৌকাঠ পেরিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছি। ইতিমধ্যে মেয়েটি মানে রিতুর সঙ্গে আমার বিভিন্ন জায়গায় দেখা হয়েছে। রিতু প্রায়ই আগ বাড়িয়ে আমার সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করেছে। আমিও এটিকে স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা বোধ আর মোটামুটি সফল পূর্বসূরির সঙ্গে লেখাপড়া বিষয়ক আলোচনা ছাড়া অন্য কোনো অর্থ খোজার চেষ্টা করিনি। তাছাড়া আমাদের ধর্মীয় ব্যবধানটাও আমি খেয়ালে রাখতাম। এর অর্থ এই নয় যে, আমি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি অথবা রিতু দেখতে-শুনতে মাঝারি মানের কোনো মেয়ে। রিতুর মতো প্রতিমা সদৃশ মেয়ে আমার নজরে পড়েনি।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যেতে পারে আমাদের উপজেলাটিকে। এর মধ্যে অনভিপ্রেত জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা কস্মিনকালেও আমার মধ্যে ছিল না। কিন্তু না থাকলে কি হবে? মানুষ ভাবে এক, নিয়তি টেনে নিয়ে চলে আরেক পথে।

তখন বোধ করি আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। মিডটার্ম পরীক্ষা শেষে কয়েকদিনের অবকাশে গ্রামে এসেছি। এসেই শুনি, জিতু আর রিতুর একমাত্র বড় ভাই মিলনদার বিয়ে। আমাদের পাশের উপজেলা মহাদেবপুর। তারই এক বাণিজ্য কেন্দ্র শিবগঞ্জের এক ব্যবসায়ী পরিবারে।

জুন মাসের শেষ। আগাম বন্যার সম্ভাবনার জানান দিচ্ছে আত্রাইয়ের কূল উপছানো পানি। সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কারণে বিয়েতে হিন্দু-মুসলিম সবারই নিমন্ত্রণ হয়েছে। আমাদের পরিবারও বিয়ে এবং বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ থেকে বাদ পড়েনি। আমিও মনটাকে হালকা করার জন্য বরযাত্রী হিসেবে যোগ দিলাম।

বিয়ের লগন মধ্যরাতের পরে হবার কারণে আর শিবগঞ্জ ভাটির দিকে, তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে বরযাত্রা হবে নৌকায় করে। ভাড়া করা হয়েছে দেড়শ দুইশ মানুষ বহন করতে পারে এ রকম বিশাল আকৃতির নৌকা। নৌকার কাঠের পাটাতনের উপরে বাশের মজবুত বাতা এবং পলিথিন কাগজের সমন্বয়ে ছাউনি যা বৃষ্টির পানি থেকে ভেতরের মানুষকে তো রক্ষা করবেই, আবার আবহাওয়া ভালো হলে তার ওপর বসে আড্ডা দেয়া যাবে।

বিকেলে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সূর্য অস্তমিত হবার ঘণ্টাখানেক আগে ঢাক-ঢোলের নিনাদ আর শানাইয়ের মিষ্ট সুরের সঙ্গে কুলবধূদের উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। হালকা বৃষ্টির পরে আকাশে কিছু পেজা শাদা মেঘ ছাড়া প্রায় পরিষ্কার। আমরা নৌকার ওপরে বসে অস্তগামী সূর্যের সোনালি ছটায় ভেজা সবুজ গাছের পাতায় আলোর খেলা দেখতে এগিয়ে চললাম। ক্রমেই চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। নৌকায় মোমবাতি জ্বালিয়ে সমবয়সীরা তাশ খেলতে বসে গেল। কোথাও বা আলো-আধারির সুযোগে অল্প-বিস্তর পান পর্বও চলতে থাকলো।

দুই দিন হলো পূর্ণিমা পার হয়েছে। তাই ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই পূর্ব আকাশে দেখা দিল গোলাকার থালার মতো রূপালী চাদ। এখন যেদিকে চোখ যায়, দেখি রাশি রাশি রূপা কে যেন হেলাভরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছে। আমি বলতে গেলে আমিতে নেই। হঠাৎ চিকন সুরেলা কণ্ঠে সংবিৎ ফিরে পেলাম। কিছুটা অপ্রতিভও বটে। ঠিক এ রকম একটা পরিস্থিতির জন্য কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলাম না।

সজলদা, কেন এতো এড়িয়ে চলো আমাকে?

কই? না তো!

সব সময় কিছু দায়সারা উত্তর দিয়ে সরে পড়। কেন আমি কি বাঘ ভালুক?

না, না, না। তা হবে কেন?

তবে? আমাকে দেখলেই আড়ষ্ট হয়ে যাও। আমি দেখতে কি এতোই খারাপ যে, আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলতেও তোমার বাধে?

তার একেকটা কথার তীরে আমি কুপোকাৎ। হঠাৎ আক্রমণের জন্য যুৎসই কোনো প্রতি উত্তরও দিতে পারছি না।

হঠাৎই রিতু আমাকে প্রপোজ করে বসলো। এখানেই শেষ নয়, এ রকম একটা পরিবেশ আর আমার অসহায়ত্বের পুরোপুরি ফায়দা ওঠালো সে। শুধু প্রপোজ নয়, আমার কথা আদায় করতেও ছাড়লো না সে।

দেখো, এতোশত বুঝি না, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমার।

এ বাক্যগুলো কোনো মেয়ে যে এতো অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না। আমার মতো একটা ডানপিটে ছেলের কান দিয়েও গরম হাওয়া বের হতে লাগলো। শুধু অস্ফুট স্বরে বললাম, এ কি করে হয়?

আচ্ছা, তোমার যদি অন্য কোনো পছন্দ থাকে তাহলে কথা নেই। তবে জেনে রাখো, এ বিয়ের আগেই আর কেউ আমাকে দেখতে পাবে না।

খুবই ভীতস্বরে বললাম, না না, তা নয়।

তাহলে আর কোনো কথা নয়। তুমি আমার। বলেই সে দ্রুত সরে পড়লো।

আর আমি?

রাত তিনটা পর্যন্ত বিয়ে বাড়িতে পৌছানোর আগ পর্যন্ত জেগে থাকলাম। আমার প্রকৌশলী মস্তিষ্ক থেকে কোনো সমাধান বের করতে ব্যর্থ হলাম। কেননা রিতু সবার ছোট হবার দরুন অত্যন্ত একরোখা। তাই মেয়েদের স্বাভাবিক লাজ লজ্জাকে উপেক্ষা করে সে যখন এ পর্যন্ত এসেছে তখন তাকে ফেরানো যাবে না। শুধু তাই নয়, আমার যে কোনো নেতিবাচক ব্যবহারে সে কোনো বড় অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। তাই সমাজ সংস্কারের হিসাব করতে গিয়ে একটা জ্যান্ত প্রতিমাকে বিসর্জন দেয়ার মতো কাপুরুষ হবার কথাও মেনে নিতে পারলাম না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, আমিও তাকে ফেরাবো না।

বিয়েতে আমরা অনেক মজা করলাম। হিন্দুদের বিয়ে খুব দীর্ঘ প্রক্রিয়া। অনেক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে যদিও বা বিয়ে শেষ হয়, তারপরে আসে বাসি বিয়ে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার সুযোগে আমরা সকলের চোখ এড়িয়ে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করলাম। শুধু বিয়ে নয়, বৌ–ভাত পর্যন্ত পুরো সময়টা রিতুদের ওখানেই কাটলো আমার।

ইতিমধ্যেই আমি ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের কর্ম প্রক্রিয়া ঠিক করে ফেললাম। রিতুকে বোঝালাম কেউ–ই আমাদের এ সম্পর্ককে মেনে নেবে না। তাই আমার প্রতিষ্ঠিত হবার আগ পর্যন্ত আমরা সকলকে এড়িয়ে চলবো। আমাদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমও ঠিক করে ফেললাম আমারই বন্ধু মুনুকে। তবলায় দক্ষতার কারণে রিতুদের বাড়িতে মুনুর অবাধ যাতায়াত। তাছাড়া মুনুকে রিতু কাকা বলে ডাকে। রিতু প্রতিমা আর আমি জল। সজলের জল। এ ছদ্ম নামে আমাদের প্রেম খুব মসৃণ গতিতে এড়িয়ে যাচ্ছিল।

ইতিমধ্যেই রিতু এসএসসি পাস করে ভর্তি হলো দিনাজপুর মহিলা কলেজে। দিনাজপুরে রিতুর মাসিমার বাড়ি থাকলেও রিতু হস্টেলেই থাকতো। আর আমি জীবন ও জীবিকার তাগিদে বিসিআইসি–র ঘোড়াশাল সার কারখানায়। আমাকে প্রেমের তরীটা ঘাটে ভেড়াবো। ঠিক সে সময়েই বিপত্তিটা ঘটলো। যে করেই হোক আমাকে নিয়ে রিতুর বাড়িতে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। রিতুর বাবাও তার বিয়ের জন্য হন্যে হয়ে উঠলেন।

একে তো খুব সুন্দরী, তার উপরে অবস্থা সম্পন্ন ঘরের মেয়ের জন্য সুপাত্রের অভাব হবার কথা নয়। কিন্তু রিতু সবগুলোকে হঠিয়ে দিচ্ছিল তার পড়াশোনার ছুতায়। ঠিক এ রকম একটা সময়ে আমার একটা চিঠি পড়লো হস্টেল সুপারের হাতে। রাগী, অবিবাহিত এ মহিলা সন্দেহ হলেই কোনো চিঠি খুলে পড়তে দ্বিধা করতেন না। আর দুভার্গ্যক্রমে হস্টেল সুপার ছিলেন রিতুর মাসিমার বান্ধবী। আমার চিঠি খুলে পড়ে সব কিছু জানালেন রিতুর মাসিমাকে। তারপরে রিতুর অজান্তে একটা চক্রান্ত তৈরি হলো।

রিতুর ছোট কাকা কালকাতায় থাকেন। তাছাড়া রিতুর অন্য দুই বোনেরও বিয়ে হয়েছে কলকাতায়। এসএসসি পরীক্ষার পরে রিতু সবার সঙ্গে গেল কলকাতায়। আমাকে জানিয়ে গেল মানসিক প্রস্তুতির জন্য। কেননা রিতু আর দেরি করতে চায় না। কিন্তু রিতু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি এ চক্রান্তের কথা।

কালকতায় গিয়েই জানতে পারলো রিতুর ছোট কাকা তার বিয়ে ঠিক করেছেন। ছেলে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে কমপিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স। ছেলেদের খুবই তাড়া। ইতিমধ্যেই কোনো এক রেস্টুরেন্টে কন্যা দেখার পালা শেষ।

মিলনবৌদি রিতুকে অনেক কনভিন্স করার চেষ্টা করেছেন।

রিতুর এক কথা, সে এ বিয়ে করবে না। বিয়ে করলে সে সজলকেই করবে। সে তার বৌদিকে একথাও জানিয়েছে যে, যদি তারা রিতুকে তার অমতে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে তবে সে আত্মহত্যা করবে।

রিতুর বৌদি কিছুটা ভীতু প্রকৃতির। তিনি এসব কথা আর কারোর সামনে বলতে সাহস করেননি।

বিয়ের আয়োজন শেষ। গোটা বাড়ি বিয়ের আনন্দে আত্মহারা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বর আসবে। কন্যাকে সাজানোর জন্য মেয়েরা এসে দেখে রিতুর ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পরেও কোনো সাড়া–শব্দ না পেয়ে যখন দরজা ভাঙা হলো ততোক্ষণে রিতু এ জগতের মায়া কাটিয়ে চলে গেছে। ঘরের ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে তার অসাড় দেহ। বিছানার ওপরে এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা *বিসর্জনেই জলের সঙ্গে প্রতিমার মিলন হবে। তাই...* ।

বাক্যটি আর শেষ করেনি।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখের কোণা মুছলাম। নাজমুলকে কি করে বলি, নির্দিষ্ট সময়ান্তে সে তার পরিবারের সঙ্গে মিলবে।

আর আমি?

এপার থেকে ওপারে যাবার আগে কোথায় পাবো আমার প্রতিমাকে।

আবু ধাবি থেকে

কারেন্ট জাল

- মোস্তফা সারোয়ার

কিছুদিন আগের কথা। এক বন্ধুর কাছে শোনা এই ঘটনা। তার মতো করেই বর্ণনা করছি।

আমার নানাবাড়ি কুমিল্লার দাউদকান্দি। কলেজ ছুটি ছিল। তাই নানাবাড়ি যাওয়ার জন্য মন স্থির করলাম। তখন ছিল বর্ষার মরসুম। খাল, বিল ও ক্ষেত খামার ছিল পানিতে ভরপুর।

আমার আপন কোনো মামা নেই। শুধু বৃদ্ধ নানা–নানি সেখানে থাকেন। নানাবাড়ির পাশেই আমাদের দূরসম্পর্কের একজন মামা আছেন। তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তবে সেই মামার সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক। আমি ঢাকা থেকে কুমিল্লা গেলে তার সঙ্গেই বেশি সময় কাটাই।

এই এলাকায় বর্ষা মরসুমে তেমন কাজ থাকে না। মূলত মাছ ধরে ও শহরের দিকে টুকটাক কাজ করে কোনো মতে দিন চলে লোকজনের। আমার ওই মামার চার ছেলে, দুই মেয়ের বড় সংসার। বর্ষার মরসুমে কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরে তিনি সংসার চালান।

সে বছর বিকালে চারটার দিকে নানাবাড়িতে নাশতা খাচ্ছি। এমন সময় মামা এলেন। একটু দূর থেকে আমাকে হাত ইশারায় ডাকলেন। আমি দ্রুত নাশতা শেষ করে তার কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, ভাগিনা, চলো তোমাকে নিয়ে আজকে নৌকায় গ্রাম ঘুরবো।

তার কথায় রাজি হয়ে গেলাম। কারণ নৌকা ভ্রমণ আমার খুব প্রিয় একটা শখ। এর আগে অনেকবার নৌকা দিয়ে ঘোরার অভিজ্ঞতা আছে আমার। এই মামার সঙ্গেও বর্ষা মরসুমে দূর–দূরান্ত ঘুরে বেড়িয়েছি।

মামার নৌকাটি ছিল খুবই ছোট। এই নৌকা তিনি মূলত কারেন্ট জাল পাতা ও জালে আটকা পড়া মাছ সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করেন। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার, তার ছিল চারটি বড় কারেন্ট জাল।

এ মাছ ধরার নৌকা দিয়েই আমাদের নৌকা ভ্রমণ আরম্ভ করলাম। চমৎকার পরিবেশ, অনেক শাপলা ফুটে আছে চারদিকে, বেশ দূর দূর এক একটি বাড়ি মনে হয় যেন নদীর বুকে ছোট ছোট চর।

মামা একটি বাড়ি থেকে নৌকা ভিড়িয়ে আমাকে নৌকায় রেখে ভেতরে গেলেন। এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। মামার মুখটা কেমন যেন বিষণ্ন লাগছিল।

এভাবে মামা তাদের আশপাশে সকল বাড়িতে গিয়ে কি যেন আলাপ করছেন এবং একটু পরে বেরিয়ে আসছেন। আমার এসব ভালো লাগছিল না। কারণ আমাকে রেখে তিনি অন্য জায়গায় বেশি সময় দিচ্ছেন। ঘুরে বেড়ানোর কোনো মজাই পাচ্ছি না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

মামাকে বললাম, মামা চলুন, বাড়িতে ফিরে যাই।

মামা বললেন, একটু দেরি করো, আরো দুটি বাড়ি দেখেই চলে যাবো।

মামা দুটি বাড়ি গিয়ে আগের মতোই বিষণ্নভাবে ফিরে এলেন।

মামা আসার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি কিছু খুজছেন?

তিনি বললেন, আজ আসলে তোমাকে বেড়ানোর জন্য নিয়ে আসিনি। তুমি তো জানো, আমি কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরে সংসার চালাই।

বললাম, হ্যা।

তিনি বললেন, ভাগিনা, গতকাল রাতে আমার সবগুলো জাল চুরি হয়ে গেছে। আজ এসেছি সেই জালগুলোর কোনো খোজ পাওয়া যায় কি না তা জানতে। ভাবলাম তুমি একা বাড়িতে থেকে কি করবে। তাই তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। মামা কাপা কাপা গলায় কথাগুলো বলে থামলেন।

দেখলাম মামার চোখ পানিতে টল টল করছে।

তারপর মামা মাথা নিচু করে আমাকে বললেন, ভাগিনা, আমার চারটি ছেলের মধ্যে যদি একটি ছেলে মারা যেতো, আমি এতো কষ্ট পেতাম না। এ কথা বলেই মামা অঝোরে কাদতে লাগলেন।

তার চোখের পানি ও বর্ষার পানি একাকার হয়ে যাচ্ছে। কোনো পুরুষ মানুষকে এভাবে কখনো কাদতে দেখিনি। এরই মধ্যে চারদিকে রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। বুঝতে পারছি, আগামী দিনগুলো মামার জন্য এর চেয়ে বেশি অন্ধকার অপেক্ষা করছে। এভাবেই শেষ হয়েছিল আমার সেই দিনের নৌকা ভ্রমণ।

এখনো কেউ নৌকা ভ্রমণের কথা বললে আমার চোখের সামনে ভেসে আসে আমার সেই মামার কষ্টে ভরা মলিন মুখ।

মাতুয়াইল, ঢাকা থেকে

লোভ

– আলী হাসান মনির

এক শুক্রবার কম্পানি থেকে পালিয়ে গেলাম। উদ্দেশ্য সোনার হরিণ ধরবো। সোনার হরিণ থাকে স্বপ্নের দেশ ইটালিতে।

ইটালির পার্শ্ববর্তী দেশ লিবিয়াতে বৈধভাবে ভিসা নিয়ে এসেছিলাম ২০০১ সালের জুলাই মাসে। আমার কর্মস্থল ছিল বেনগাজি শহরে। ইটালি যেতে হবে নৌপথে। তাও আবার বেনগাজি থেকে নয়, রাজধানী ত্রিপলি থেকে।

কম্পানি থেকে পাসপোর্টের ফটোকপি নিয়ে দালালের মাধ্যমে অনুমতিপত্র আগেই বানানো হয়েছিল। বেনগাজি থেকে ত্রিপলির দূরত্ব প্রায় এক হাজার দুইশ কিলোমিটার। বাই রোডে যেতে প্রায় এগারো ঘণ্টা লেগে গেল। পথে তিনবার চেক পোস্টে চেক করলো। যেহেতু আমাদের বেনগাজি থেকে ত্রিপলি যাবার অনুমতিপত্র আছে সেহেতু আমাদের কোনো অসুবিধা হলো না। আমাদের বলছি এই কারণে যে, আমরা পাচজন এক সঙ্গে পালিয়েছি।

বেনগাজি থেকে আমাদের সঙ্গে একজন বাংলাদেশি দালাল ত্রিপলি-তে এলেন। তিনিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন ত্রিপলি। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের বাতাকা তিনিই বানিয়ে দিয়েছিলেন। তার একটি ছদ্ম নাম হলো রিপন। আমাদেরকে ত্রিপলিতে দুই পাকিস্তানি দালালের হাতে তুলে দিয়েই আবার বেনগাজিতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

পাকিস্তানি দালালরা আমাদের পাচজনের দলটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। আমি ও সোহেল এক গ্রুপে আর বাকি তিনজনকে রাখা হলো অন্য গ্রুপে। আমাদের দুইজনকে নিয়ে যাওয়া হলো একটি রুমে সেখানে আগে থেকে আরো দশজন ছিল। ঘরটি মাটির নিচে অর্থাৎ আন্ডারগ্রাউন্ডে। ঘরের ধারণ ক্ষমতা ছয়জনের মতো হলেও আমরাসহ এই পর্যন্ত বারোজন। দুদিন যেতেই এ সংখ্যা বিশ ছাড়িয়ে গেল। আমাদের বাইরে যাওয়া নিষেধ। কারণ আমাদের কারোরই পাসপোর্ট নেই। একটানা পচিশ দিন সেই অবরুদ্ধ ঘরে বন্দী ছিলাম।

একদিন রাত দশটার দিকে আমাদেরকে বের করলো। এর মধ্যে আমাদের থেকে পাচশ ইউএস ডলার নেয়া হলো।

২৫ মে ২০০৪-এ রাত এগারোটার দিকে আমাদের একুশজনের একটি গ্রুপকে তোলা হলো একটি নৌকায়। নৌকায় তোলার আগে আমাদের কাছ থেকে আরো আটশ ডলার নেয়া হলো। প্রথমে এক হাজার দুইশ ডলারের কথা থাকলেও আমাদের কাছ থেকে নেয়া হলো এক হাজার তিনশ ডলার।

আমাদের মাঝ থেকে এক ইজিপশিয়ানকে সারেং বানানো হলো। সারেংয়ের কাছে একটি ম্যাপ, আরেকটি দিক নির্ণয়ের কমপাস দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হলো ইটালির সিসিলি দ্বীপের অবস্থানে।

আমাদেরকে শুধু এক কাপড়ে নৌকায় তোলা হলো। সঙ্গে কিছু শুকনো খাবার এবং পানি দেয়া হলো। পর্যাপ্ত (দালালের ভাষায়) পরিমাণের জ্বালানি দিয়ে রাত সোয়া বারোটায় আমাদের যাত্রা শুরু হলো। ভূমধ্যসাগরের বুক চষে ছুটে চললো আমাদের রাবারের নৌকা। নৌকায় বসে শুধু আল্লাহর নাম জপছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি।

ছয় ঘণ্টা চলার পরে রাতের আধার কেটে দিনের আলো ফুটলো। যেদিকেই তাকাই, শুধু পানি আর পানি। ভূমধ্যসাগরের লোনাজল ছাড়া কিছুই চোখে দেখা যায় না। ভয়ে কলিজাটা এতোটুকু হয়ে গেল। সাগরের উর্মিমালা যখন আছড়ে পড়ে রাবার নৌকায়, মনে হয় এই বুঝি ডুবে যাবো। নিভে যাবে নিজের প্রিয় প্রাণ প্রদীপ।

ইতিমধ্যে খাবার জন্য পানি যা ছিল, প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সারেং আরবি ভাষায় বার বার বলছে পানি কম করে খাওয়ার জন্য। কিন্তু ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ। তাই সবাই বার বার পানি খেতে চাচ্ছে।

চব্বিশ ঘণ্টা নৌকা চালিয়েও যখন ইটালির সিসিলি দ্বীপের সন্ধান পেলাম না তখন এক ভয়াবহ অবস্থা।

সারেং ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। সারেংয়ের বক্তব্য হলো, এই রকম যদি আর পাচ ঘণ্টা চালিয়ে সামনের দিকে যাই, তারপরও যদি কোনো স্থলভাগ না পাই তাহলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। কারণ আমরা জ্বালানি সংকটে পড়বো।

সর্বসম্মতিক্রমে অনুমতি দেয়া হলো আরো পাচ ঘণ্টা চালিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু বিধি বাম। তারপরও আমরা পেলাম না সিসিলি দ্বীপের সন্ধান। এখন উপায়! খাবার বলতে যা ছিল তা শেষ হয়ে গেছে আরো আগে। সারেং বলছে জ্বালানি সংকটের কথা।

চারদিকে থেকে কান্নার রোল পড়ে গেল।

সারেংকে বললাম, তোমার কমপাস ও ম্যাপ কি বলে, আমরা এখন কোথায় আছি?

সে বললো, সে জানে না, এখন আমরা কোথায় আছি।

স্বপ্নের দেশ ইটালির সোনার হরিণের আশা বাদ দিয়ে জীবন বাচানোর জন্য বললাম, সামনের দিকে গেলে আমাদের আরো বিপদ হতে পারে। তার চেয়ে আবার ফিরে চলো।

কোনো উপায় না দেখে সারেং তাই করলো।

এখন আর কেউ–ই ইটালি যেতে চায় না, শুধু চায় জীবনটা যেন বাচে।

এদিকে পানির পিপাসা, পেটের ক্ষিধেয় আমরা এখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে। সবার মুখে একটি শব্দ, *আল্লাহ বাচাও*। পানির পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার অবস্থা।

সারেং আর পারছে না হাল ধরে বসে থাকতে। সে আমাকে ডেকে ম্যাপ ও কমপাস বুঝিয়ে দিল। তার অবস্থা আরো খারাপ। চোখের জল আর সাগরের লোনা জল এক হয়ে যাচ্ছে।

আমরা ফিরে চলেছি। ঘণ্টা দুই চলার পর দেখা হলো মাছ ধরার এক ট্রলারের সঙ্গে। *হেলপ হেলপ* বলে চিৎকার করছি। কিন্তু তারা তা শোনে না।

এক সময় ইজিপশিয়ানকে দিয়ে ডাক দেয়ালাম। এবং তাদের কাছে আমাদের রাবারের নৌকা ভেড়ালাম।

মাছের ট্রলার থেকে আমাদের কিছু শুকনো রুটি ও কিছু খাবার পানি দেয়া হলো। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য।

তাদের কাছ থেকে যা শুনলাতম তা হলো যে আমরা পথ ভুল করে টিউনিস–এর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি। এখান থেকে ইটালি যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমরা মুসলমান জেনে তাদের মনে একটু মায়া হলো এবং তাদের সহযোগিতায় আরো চোদ্দ ঘণ্টা নৌকা চালিয়ে লিবিয়ার স্থলভাগে এসে পৌছালাম। ততোক্ষণে প্রাণ যায় যায় অবস্থা।

ইজিপশিয়ান সারেংয়ের সহযোগিতায় বাকি সারা দিন ও সারা রাত ঘুমিয়ে পরের দিন সেই পাকিস্তানি দালালের কাছে গিয়ে আমাদের ঘটনা বর্ণনা করলাম।

কিন্তু পাকিস্তানি দালাল বলে, তাদের কিছুই করার নেই। আবার চান্স নিলে আবারও এক হাজার তিনশ ডলার দিতে হবে।

তাকে বললাম, আমার কাছে দুইশ–র বেশি ডলার নেই।

কিন্তু সে অপারগতা প্রকাশ করলো। এও বললো যে, যদি বেশি ডিসটার্ব করি তাহলে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবে।

অগত্যা ডলার ফেরত পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসতে হলো। অথচ বেনগাজির দালাল বলেছিল যে, একবারে যদি না যাওয়া যায় তাহলে দ্বিতীয়বার চান্স দেয়া হবে বিনা টাকায়। সব মিথ্যা কথা।

এখন এক *মাইনকা চিপায়* পড়েছি। দেশে যে ফিরবো তারও কোনো উপায় নেই। কারণ হাতে পাসপোর্ট নেই। কম্পানির কাছেও ধরা দিতে পারছি না। হাতে ডলারও নেই। পয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মরুভূমির বুকে সহায়-সম্বলহীন অসহায়ের মতো ঘুরছি।

বাংলাদেশে মা বাবা জানে, না যে, তার অতি আদরের ছেলের এই ভয়াবহ পরিণতি। তারা জানেন আমি কম্পানিতে কাজ করছি। ব্যাংকে টাকা পাঠাচ্ছি, এক সময় দেশে ফিরবো। কিন্তু আমি জানি না কি করছি, আদৌ দেশে ফিরতে পারবো কি না। নাকি এ মরুভূমির দেশেই সারা জীবন পার করতে হবে! কথায় বলে, *অতি লোভে তাতি নষ্ট*। নিজ হাতে নষ্ট করলাম আমার এক সুন্দর ভবিষ্যৎ, সুন্দর একটি সকাল।

যেই সুন্দর একটি রাতের জন্য সেই ২০০১ সালে ২২ জুলাই পাড়ি দিয়েছিলাম এই লিবিয়ার মরুভূমির বুকে, এখানেই কি শেষ হবে আমার জীবন? আমি কি আর চোখ মেলে দেখবো না আমার মাকে যিনি আমার কপালে চুমু দিয়ে বিদায় দিয়ে বলেছিলেন, আবার আমার কোলে ফিরে এসো তুমি।

বেনগাজি, লিবিয়া থেকে
hossinmonir2002@yahoo.com

রিপু কাহিনী

- এসএম শহীদুল ইসলাম হেবেন

হঠাৎ মুখ ফসকে বের হয়ে গেল, লঞ্চে আগুন লাগিয়ে দেবো। কেরানিকে কথাটা বলেই বুঝে ফেললাম মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছি।

গত দুই দিন হলে *এরশাদের গদিতে আগুন জ্বালো এক সাথে* জাতীয় স্লোগান শুনেছি অনেক। আজ আর্মি রেইডের পর পরই তাৎক্ষণিক হল খালি করার নোটিশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মাত্র এক ঘন্টা সময় দিয়েছে হল ছাড়তে। কোনো মতে ব্যাগ গুছিয়ে একই হলের জুনিয়র ছাত্র জিয়াকে নিয়ে বুয়েট ক্যাম্পাস ছেড়ে দুপুর দুটোর মধ্যে বরিশালে যাবার লঞ্চে চেপেছি। পকেটে মাসিক খরচের সামান্য কয়টা টাকা অবশিষ্ট আছে। বিশ পচিশ টাকা হয়তো হবে। লঞ্চের ভাড়া হলেই হবে। লঞ্চ থেকে নেমে রিকশার পরিবর্তে না হয় হেটে বাসায় চলে যাবো।

লঞ্চে কখনো আমাদের পুরো ভাড়া দিতে হয় না। ছাত্রদের জন্য সব লঞ্চই পাচ টাকা ছাড় দিয়ে পচিশ টাকায় থার্ড ক্লাসের টিকেট দিয়ে থাকে। সেভাবে আমরা পচিশ টাকা করে ভাড়া দিতে চাইলে কেরানি তা মানতে নারাজ। তার বক্তব্য, লঞ্চে মালিক স্বয়ং উপস্থিত আছেন। তার হুকুম, কোনো কনসেশন দেয়া যাবে না। সে নাকি মালিককে আমাদের আর্জিটা জানিয়েছিল। কিন্তু মালিক অনড়।

বয়স কম, রক্ত গরম। চারদিকে এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন। প্রায় প্রতিদিন বিক্ষোভ আর মিছিল হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। তার কিছুটা হলেও আচ লেগেছে প্রতিবেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুয়েটে।

মাথা গরম করে বেফাস কথা বলে ফেলেছি। মনে অনুশোচনা হচ্ছে দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বলার জন্য। এ কথা লঞ্চ মালিকের কানে গেলে তিনি নিশ্চয় সহজভাবে নেবেন না। ভেতরে ভেতরে একটু ভয়ও হচ্ছে।

যাই হোক। কেরানি এরপর আর ভাড়া চাইতে আসেনি।

লঞ্চের ছন্দময় কাপুনিতে আমার চমৎকার ঘুম হয়। রাতে ঘুমিয়েছি বেশ। ভোর রাতে বরিশাল টার্মিনালে লঞ্চ ভিড়েছে টের পেয়ে দ্রুত বিছানা গুটিয়ে উঠে পড়লাম। কারণ এটা ঝালকাঠির লঞ্চ। বরিশাল টার্মিনালে বেশিক্ষণ সময় নেবে না। দোতলা থেকে নিচ তলায় নেমে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে লাইন ধরে সিড়ির দিকে

এগোচ্ছি। সামনে জিয়া। আমি ঠিক তার পেছনে। লঞ্চ থেকে নামার আগেই স্মরণ হলো টিকেট কাটা হয়নি। কেরানিকেও সিড়ির কাছাকাছি এক অবস্থানে দাড়িয়ে টিকেট বিক্রি করতে দেখলাম। যারা আগের টিকেট কাটেনি তারা ভিড় করে টিকেট কিনছে।

লাইন ছেড়ে কেরানি সাহেবকে টিকেটের কথা বললাম।

তিনি বললেন, আপনাকে সাহেবের কাছ থেকে টিকেট কিনতে হবে। সে একটি ছেলেকে ডেকে আমাকে তিন তলায় মালিকের কাছে নিয়ে যেতে বললো।

জিয়া আমাকে ফলো করলো।

তিন তলার ডেকের রেলিং ধরে দাড়িয়ে নিচে যাত্রীদের নেমে যাওয়া প্রত্যক্ষ করছেন পৌঢ়, অপেক্ষাকৃত শীর্ণ, লম্বাকৃতির এক ভদ্রলোক। মনে হলো নেমে যাওয়া যাত্রীর সংখ্যা গুণছিলেন তিনি উপর থেকে।

ছেলেটি বললো, *ছার টিকেটের লেইগ্যা ওনাগো পাডাইছে আপনের ধারে কেরানিসাব।*

লক্ষ্য করলাম, আমাদের দেখে তার চেহারায় কৌতুক মেশানো কাঠিন্য ভর করলো। *কি, তোরা নাহি আমার লঞ্চে আগুন লাগাইতে চাইছোস? লাগা দেহি কেমনে আগুন লাগায়। কি পড়ো? কোন জাগার ছাত্র তোরা? পড়াশোনা হরো নাহি মাস্তানি হরো! মাস্তানি... দিয়া হান্দাইয়া দিমু! দুই কুটি টাকা লোন নিয়া লঞ্চ কিনছি তোগো আগুন দেওনের লেইগ্যা!... পুত!...!*

একনাগাড়ে বকে, রাগে কাপতে লাগলেন লঞ্চ মালিক। আমার মুখে ভাষা নেই। আমতা আমতা করে শুধু কয়েকবার বললাম, আমার বড় ভুল হয়েছে। এ রকম *আপত্তিকর শব্দ* ব্যবহার করা ঠিক হয়নি আমার। আমরা বুয়েটের ছাত্র। হল থেকে প্রায় তাড়িয়ে দিলে হল খালি করা হয়েছে আজ। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি।

এ পর্যায়ে ভদ্রলোক একটু শান্ত হলেন মনে হলো।

বুয়েটে পড়ো তোমরা? কোন ডিপার্টমেন্টে? আমার ছোট ছেলে চার বছর আগে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে এখন কানাডায় আছে। সে শেরেবাংলা হলে থাকতো। *কও, এতো টাকা খরচা কইরা চাইরজন শেয়ারে লঞ্চটা নামাইছি। এখন যদি কেউ কয় লঞ্চে আগুন দিবে তাইলে কার না মাথা খারাপ হয়! আমি টিসিবি-র ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলাম। দুই বছর হইলো রিটায়ার করছি। চাকরিতে থাকা অবস্থায় বন্ধুর লগে শেয়ারে লঞ্চের ব্যবসা শুরু করেছি। এখন রিটায়ারের টাকা দিয়া বড় স্টিল বডি লঞ্চ নামাইছি।*

এরপর তিক্ততার অবসান হলো। ততোক্ষণে লঞ্চ বরিশাল ঘাট ছেড়ে ঝালকাঠির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। এর মাঝে নামার সুযোগ নেই। তাই ভদ্রলোকের অফার করা চায়ে আপ্যায়িত হতে দ্বিধা করলাম না। চায়ের ফাকে ছাত্র জীবনে তার আর্থিক দৈন্যতার কথা বললেন। সফলতার জন্য কি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার গল্প করলেন। নিজের কষ্ট ছেলেমেয়েকে ছুতে দেননি। সুশিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত দুই ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে সুখে আছেন।

ঝালকাঠি ঘাটে নামার আগে বললেন, তিনি চাইলে বরিশাল ঘাটে আরো কিছু সময় লঞ্চ বিলম্ব করাতে পারতেন। ইচ্ছা করেই আমাদের এটুকু শাস্তি দিলেন যাতে ভবিষ্যতে কখনো রাগের বশে স্থান-কাল-পাত্র বুঝতে ভুল না করি।

পরবর্তী জীবনে এ লজ্জাজনক ঘটনা আমাকে প্রতি মুহূর্তে রাগ নামের রিপুটি সংবরণ করতে এখনো করছে।

ঢাকা থেকে

চুল প্যাচানি

– কিরণ

১৯৯৬। তখন বর্ষাকাল। আমি তখন ক্লাস এইট–এর ছাত্র। একদিন স্কুল থেকে বাসায় এসে শুনলাম খালাতো ভাইয়ের বিয়ে। মনটা খুশিতে ভরে গেল।

অনেক অপেক্ষা করে সেই কাঙ্ক্ষিত দিনটা এলো। আমরা সবাই যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। যখন শুনলাম নদী পথে যেতে হবে তখন মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। যদিও আমি সাতার জানি।

যাহোক, ভাইদের জোরাজুরিতে যেতে রাজি হলাম।

নির্দিষ্ট সময়ে সবাই নৌকায় গিয়ে উঠলাম। সবাই আসার পর আমাদের নৌকা ছেড়ে দিল। আমরা সবাই মিলে খুব মজা করছি আর পাশ দিয়ে যে, সব নৌকা যাচ্ছে তাদের দেখে, বিশেষ করে মেয়েদেরকে হাত নেড়ে হাই বলছি। মেয়েরাও কম নয়, তারাও পাল্টা আমাদের জবাব দিচ্ছে। আবার সবাই মিলে গান ছেড়ে নাচানাচি করছি।

হঠাৎ চারদিকে প্রবল বাতাসের আনাগোনা শুরু হচ্ছে। এবং তা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে নদীর ঢেউ পাল্লা দিয়ে বড় হচ্ছে। নদীর ঢেউ দেখে প্রচণ্ড কাদতে শুরু করলাম। তখন আমার কেবলই মনে হচ্ছে, নৌকা যদি ডুবে যায় তাহলে আমাকে নদীর চুল প্যাচানি (ছোটবেলায় মুরুব্বিদের কাছে চুল প্যাচানির কথা শুনেছিলাম) পা প্যাচ দিয়ে নদীর নিচে নিয়ে যাবে।

সেদিন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। এখনো নদীর ঢেউ দেখলে সেদিনের কথা মনে পড়ে যায়। এ জন্য এখন নদীতে যাতায়াত করি না। যদি আবার ঢেউ ওঠে, তাহলে...!

সাভার, ঢাকা থেকে

লালিত

- জান্নাত হক

এইচএসসি পাস করে বহু পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাসের জোরে দখল করলাম দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের মহা মূল্যবান একটি সিট। শুরু হলো আমার নতুন এক জীবন। এ জীবনে দেখা পেলাম না আমার পুরনো বন্ধুদের। কারণ তারা ছড়িয়ে–ছিটিয়ে পড়েছে দেশের নানান প্রান্তে। তাই বরাবরের মতো অমিশুক এই আমার দিনগুলো কাটতে লাগলো নিদারুণ নিঃসঙ্গতায়।

আমার সমবয়সী অন্যদের জীবনের এই সময়টা যেমন হয়ে উঠে রঙিন থেকে রঙিনতর, আমার তেমন হলো না। রুটিন বেধে প্রতিদিন ক্লাসে যেতাম। পেছনের দিকের বেঞ্চগুলোর কোনো একটায় চুপচাপ বসে থাকতাম। লেকচার শেষ হলে ক্লাস থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পাসে একা হেটে বেড়াতাম। অন্যদের হাসি–আনন্দ এবং আড্ডায় মেতে ওঠা উপভোগ করতাম নির্ভেজাল আনন্দে। কারো সঙ্গেই তেমন মিশতাম না। ফলে ক্লাসের কারো সঙ্গে আমার সামান্য সৌজন্যমূলক সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি।

প্রথম প্রথম দুই একজন কথা বলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমার নিস্পৃহতা দেখে আর এগোয়নি। ক্লাসের সবাই সবাইকে তুই বা তুমি সম্বোধন করলেও আমার সঙ্গে যদি ভুল করে কখনো কথা বলে ফেলতো তবে আপনি সম্বোধন করতে ভুল করতো না। *আঁতেল* উপাধি দিয়ে আমাকে নিয়ে যে আড়ালে–আবডালে সবাই হাসাহাসি করতো তা ভালোই বুঝতে পারতাম।

এভাবেই দুটি বছর কাটিয়ে পা রাখলাম থার্ড ইয়ারে। এই ইয়ারের শেষ দিকে ডিপার্টমেন্ট থেকে শিক্ষা সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা নেয়া হলো। এ নিয়ে ব্যাপক হই হুল্লোড় শুরু হয়ে গেল ক্লাসে। কোথায় যাওয়া হবে এটা নিয়ে চললো তুমুল তর্কবিতর্ক। অবশেষে ঝামেলার অবসান ঘটাতে গঠন করা হলো একটি কমিটি। কমিটির সভাপতি করা হলো উচ্ছল প্রাণ ও করিৎকর্মা ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র তরুণকে। এরপর শুরু হলো সফরের জায়গা নির্ধারণের জন্য ভোটাভুটি।

বহু বাকবিতণ্ডার পর ঠিক হলো সুন্দরবনে নৌ ভ্রমণে যাওয়া হবে। এ ব্যাপারে পৃথকভাবে সবার মত গ্রহণ করা হলেও আমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলো না। আর করবেই বা কেন? আমি তো আতেল!

চাদা সংগ্রহ শুরু হলো। এক সময় শেষও হয়ে গেল। কিন্তু আমার টাকা আমার হাতেই। কেউ আমার কাছে চাদা চাইতে আসেনি।

কিছু দিন অপেক্ষা করে অবশেষে নিজেই দেবো সিদ্ধান্ত নিলাম। ক্লাস শেষে যখন তারা কয়েকজন টুরের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত তখন অসীম লজ্জা এবং সংকোচ নিয়ে ধীর পায়ে তাদের কাছে গিয়ে দাড়ালাম।

কিন্তু ব্যস্ততার কারণে কেউ আমাকে খেয়াল করলো না। অথবা ইচ্ছা করেই তাকালো না।

চলে যাবো কি না ভাবছি। এমন সময় তরুণ হঠাৎ মুখ তুলে বললো, কি ব্যাপার, কিছু বলবে?

চমকে উঠলাম। অনেক দিন পর তার মুখে তুমি সম্বোধন শুনে খুব ভালো লাগলো। অবাক হয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে উঠলো।

চাদার টাকাটা...। কোনো রকমে বলেই ধপ করে টেবিলের ওপর টাকাটা রেখে ছুট দিলাম। কেন জানি না একরাশ লজ্জা ছেকে ধরলো আমাকে। দীর্ঘ তিন বছরে কারো মুখে তুমি সম্বোধন শুনিনি বলেই হয়তো বা এমন লাগছিল।

নির্দিষ্ট দিনে রওনা হলাম সবাই। সঙ্গে গেলেন ডিপার্টমেন্টের চারজন শিক্ষক। এছাড়া প্রয়োজন মতো বাবুর্চি আর অন্য কর্মচারীদের নেয়া হলো।

রিজার্ভ বাসযোগে খুলনায় পৌছে মংলা থেকে পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক লঞ্চ ভাড়া করা হলো দুই সপ্তাহের জন্য। লঞ্চ প্রথমে এগিয়ে চললো নদী ধরে। এরপর খাড়ি চেয়ে প্রবেশ করলো সুন্দরবনে। সুন্দরবনের গহীন অরণ্যের অবারিত ও অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে সবাই বিমোহিত হয়ে গেলাম।

প্রথম দিন বেশ কিছুটা ভেতরে ঢুকে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে লঞ্চ রাখা হলো। প্রথম দিন সবাই ক্লান্ত থাকায় হই চই তেমন হলো না। সবাই খেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন দিনের বেলা ভ্রমণ শেষে সন্ধ্যার পর সবাই আড্ডায় মেতে উঠলো। আয়োজন করা হলো ছোটখাটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। গান, কৌতুক, অন্যকে নকল করে দেখানো ইত্যাদি চললো অনেক রাত পর্যন্ত। খুকুমণি কিভাবে রেসলার রকের মতো করে হাটে সেটা অভিনয় করে দেখালো পিয়াল। দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো সবাই।

এতো হাসি আনন্দের মাঝে নিষ্প্রাণ এই আমার মাঝেও কিছুটা প্রাণের সঞ্চার হলো যেন। অন্যদের মতো সবার সঙ্গে মিশে যেতে খুব ইচ্ছা করলো। কিন্তু লজ্জার কারণে কারো সঙ্গে মিশতে পারছিলাম না। তবে এর মাঝে ক্লাসের দুই একজন মেয়ের সঙ্গে কথা হলো বেশ অনেকটা যা আগে কখনো হয়নি।

নিজের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। নদীর পাড়ে কুমিরের রোদ পোহানোর রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখে লঞ্চের রেলিং ধরে আনন্দে চেচিয়ে উঠলাম। হঠাৎ পাশে তাকাতেই দেখলাম, তরুণ অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। লজ্জা পেয়ে চুপ হয়ে গেলাম।

চিৎকার করছিলে করো, আমাকে দেখে চুপ হয়ে গেলে কেন? অত্যন্ত সহজ গলায় কথাগুলো বলেই চলে গেল সে।

তাকিয়ে রইলাম তার পথের দিকে। তাকে বন্ধু ভাবতে হঠাৎ খুব ইচ্ছা হলো।

এরপর থেকে নিজের অজান্তেই খেয়াল করতে লাগলাম তার প্রতিটি মুভমেন্ট। তার উচ্ছলতা, সব কিছুর প্রতি উচ্ছ্বাস প্রকাশ, কথা বলার ঢং, সবার সঙ্গে মিশে যাবার অদ্ভুত ক্ষমতা, সব কিছুই আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করলো। মনের ভেতর জন্ম নিল এক নতুন ধরনের অনুভূতি। যার সঙ্গে আগে কখনো পরিচয় ছিল না আমার। তাকে দেখলেই হাত-পা অবশ হয়ে যেতো, নাড়াতে পারতাম না কিছুতেই। তাকিয়ে থাকতাম তন্ময় হয়ে। ভয় পাচ্ছিলাম খুব। আমার এই অনুভূতি যদি তার সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়! তাই নিজেকে সংযত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। সফলও হলাম। ফল স্বরূপ এই কয়েকদিনে যাও বা একটু মেশা শুরু করেছিলাম সবার সঙ্গে সেটা বন্ধ হয়ে গেল পুরোপুরি।

প্রতিদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ডেকে নিয়ে দাড়াতাম একাকী। তাকিয়ে থাকতাম গহীন অরণ্যের দিকে অথবা নদীর কালো পানির দিকে কিংবা অসীম নীলিমার দিকে।

একদিন এমনিভাবে দাড়িয়ে আছি। হঠাৎ পেছনে কারো উপস্থিতি টের পেয়ে ঘুরে তাকিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

মিষ্টি করে হাসলো তরুণ। কি ব্যাপার, এতো রাতে এখানে?

ঢোক গিলে জবাব দিলাম, ঘুম আসছিল না, তাই।

প্রতিদিনই কি ঘুম আসেনি?

মানে?

আমি তো গত তিন দিন ধরে তোমাকে এই সময় এখানে দাড়িয়ে থাকতে দেখছি।

লজ্জায় লাল, নীল, বেগুনি হতে লাগলাম। কোনো জবাব দিলাম না।

এরপর শুরু হলো তার গল্প। গল্পের যেন শেষ নেই। চলতেই থাকলো অনবরত।

আমি শুধু মাঝে মধ্যে *হু, হ্যা* জাতীয় শব্দ করে জবাব দিচ্ছিলাম। কখন যে ভোর হয়ে গেল কেউ-ই টের পেলাম না।

সফরের বাকি দিনগুলোতেও প্রতিদিনই তার সঙ্গে এভাবে কথা হতে লাগলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আস্তে আস্তে আমিও সহজ হয়ে গেলাম। নিজেদের অজান্তেই বেশ পাকাপোক্তভাবে বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেল আমাদের মাঝে।

সফর শেষে ঢাকায় এসেও আজ পর্যন্ত আমরা একে অপরের ভালো বন্ধু। এর মাঝে অতিক্রান্ত হয়েছে আরো দুটি বছর। আজও তাকে বলা হয়নি আমার বুকের ভেতর লালিত গোপন স্বপ্নটির কথা। হয়তো বা সেও বুঝতে পেরেছে। তাকে বলছি, হে বন্ধু, যদি বুঝতে পারো তবে সাড়া দাও। আর আমাকে এভাবে অপেক্ষায় রেখো না।

পূর্ব বাসাবো, ঢাকা থেকে

রিভার ক্রুজ

- মুনসাত হাবিব চৌধুরী

টুরিস্টের শহর লন্ডন। কি যেন এক জাদু আছে এই শহরে যার মায়া টেনে আনে হাজার হাজার পর্যটককে প্রতি বছর। বিশেষ করে শুক্রবার রাতে সারা কন্টিনেন্টাল ইওরোপ থেকে ইউরোস্টার আর বাসে চড়ে দল বেধে আসতে থাকে পর্যটকরা শনিবার, রবিবার দুটো দিন লন্ডন ঘুরে কাটাবে বলে। এবং আসে আমেরিকা-

অস্ট্রেলিয়া–মধ্যপ্রাচ্য–দূরপ্রাচ্য থেকে নানান রঙের, নানান বর্ণের মানুষ। আর লন্ডন! সে তো নিজেকে সাজিয়ে বসে রয়েছে পর্যটন তৃষ্ণা মেটানোর জন্য।

ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার এমন মিশেল পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া বিরল। দেখার জায়গা আছে কতো গুণে শেষ করা যায় না। ঐতিহাসিক স্থান থেকে শুরু করে আধুনিক নাইট ক্লাব, আর্ট গ্যালারি, জাদুঘর, রেস্তোরা, শপিং মল কি নেই এখানে। পর্যটকরাও চায় সময়টা উপভোগ করতে। কেউ যখন এসে জিজ্ঞাসা করে একটা ভালো রেস্তোরার নাম বলতে বিব্রত বোধ করি তখন। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি, হাতে গুণে শেষ করা যায় না। আবার আমেরিকানরা এসেই বলবে, ব্রডওয়ে শো কোথায় হয় বা কোনটা দেখা উচিত। ধাধায় পড়ে যাই আমি। মামা মিয়া, টু নাইট ইজ দি নাইট, লায়ন কিং, চিটি চিটি ব্যাং ব্যাংসহ কতো শো, কতোগুলো বলবো তাদের! এমন কতো স্থান রয়েছে যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরা যেখান থেকে বা যাদের মাধ্যমে ঘটেছে এমন সব ঘটনা যার মাধ্যমে রচিত হয়েছে নতুন ইতিহাস। হয়তো বা মোড় ঘুরেছে বৃটেন এবং ইওরোপসহ সারা বিশ্বের ইতিহাস। তাই পর্যটকদের কাছে লন্ডন যেন এক সোনার খনি।

এই লণ্ডন শহর পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখার জন্য রয়েছে দুটি কম্পানি। *দি অরিজিনাল সাইট সিইং টুর* আর *বিগ বাস কম্পানি*। ছাদ খোলা এই বাসগুলোতে চড়ে লন্ডনের আকর্ষণীয় স্থানগুলো দেখা যায়। লন্ডনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থানগুলোতে রয়েছে এই দুই কম্পানির স্টাফদের সরব উপস্থিতি। দুটি কম্পানির একই কাজ হলেও ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভীষণ। নিজ নিজ কম্পানির বাসে পর্যটকদের চড়াতে দুই কম্পানির স্টাফদের পেভমেন্ট বা ফুটপাথে চলে তুমুল বাকযুদ্ধ, ক্ষেত্র বিশেষে যা গড়ায় হাতাহাতিতে। যেমন ঈদের ঘরমুখো যাত্রীদের নিয়ে টানাটানি চলে গাবতলী বা সায়েদাবাদ বাস স্ট্যান্ডে।

টেমস নদীর দুই তীরে লন্ডন শহর অবস্থিত।

টেমস হলো ইংল্যান্ডসহ সারা বিশ্বের হাজারও ঘটনার সাক্ষী। আকারে–প্রকারে এই টেমস আমাদের পদ্মা–মেঘনা–যমুনার কাছে নিতান্তই শিশু। কিন্তু ইংল্যান্ডের সভ্যতা বিকাশ আর লন্ডনের বিকাশের পেছনে রয়েছে টেমস নদীর অবদান। ঐতিহ্য প্রিয় বৃটিশরা টেমসের অতীত ধরে রাখার চেষ্টা করেছে সর্বত্র। পুরনো জাহাজঘাট, যেখানে কলোনিগুলো থেকে পণ্য খালাস হতো সেই ডকল্যান্ডে আজও বোট ভেড়ে, বন্দর নেই যদিও। এখনো রয়েছে রোমান আমলে গড়ে ওঠা *বিলিংসগেট ফিশিং মার্কেট*। আমাদের দেশের বুড়িগঙ্গা–কর্ণফুলি–সুরমার মতো টেমসের এক তীরে শহর গড়ে তোলেনি বৃটিশরা। লন্ডন বিকশিত হয়েছে টেমসের দুই তীরে। অন্য কথায় উত্তর–দক্ষিণে লন্ডনকে বিভক্ত করে মাঝখান দিয়ে টেমস বয়ে চলেছে।

অনেকগুলো সুন্দর বৃজ রয়েছে টেমসের ওপর। টাওয়ার বৃজ দ্বিখণ্ডিত হয়ে নৌযান পার হতে দেয়ার পর আবার জোড়া লাগে। এই যানবাহন পারাপারের দৃশ্য এখনো মানুষ উপভোগ করে। সাদার্ক, ব্ল্যাকফ্রায়ার্স, ল্যামবেথ, চেলসি, ওয়াটারলু, ওয়েস্টমিনস্টার, লন্ডন বৃজ ছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু আকর্ষণীয় ফুট বৃজ যার ওপর দিয়ে হেটে পার হওয়া যায় টেমস। এ রকম দুটি বৃজ হচ্ছে হাংগারফোর্ড ও মিলেনিয়াম ফুট বৃজ। পর্যটকরাও আসে দলে দলে ফুট বৃজগুলোতে। রেলিংয়ে ভর দিয়ে অনেকেই দেখা যায় টেমসের ব্যস্ততা উপভোগ করতে। কি ভীষণ ব্যস্ততায় রেল বৃজগুলো দিয়ে একটু পর পরই ছুটছে ট্রেনগুলো। নিচে ক্রুজ কম্পানিগুলোর বোটগুলো পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখাতে ব্যস্ত নদী থেকে লন্ডনের আরেক রূপ।

যা বলছিলাম। আমি কাজ করি অরিজিনাল সাইট সিইং টুর কম্পানিতে। আমাদের কাজ হচ্ছে লন্ডন ঘুরতে আসা টুরিস্টদের কাছে আমাদের বাসে চড়ার লাভালাভগুলো বুঝিয়ে টিকেট বিক্রি করা। প্রতিপক্ষ কম্পানির স্টাফকে কুপোকাত করে পর্যটককে টিকেট কেনার জন্য বাগাতে কতো যে আকর্ষণের কথা বলতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। এর একটি হচ্ছে, আমাদের বাসে চড়লে আমরা টেমস নদীতে ফৃ বোট ক্রুজ করার টিকেট দেবো যাতে পর্যটকরা বোট রাইড করবেন টেমস নদীতে ফৃ। এই একটি কথাই কাজ করে জাদুমন্ত্রের মতো। বাসে

করে লন্ডন শহর ঘুরতে এসে টেমস নদীতে ফ্র রিভার ক্রুজের সুযোগ পেয়ে পর্যটকরা লাফিয়ে ওঠে খুশিতে। হলিডেতে আছে বলে সবারই মুড থাকে খুব ভালো। টেমস নদীতে নৌ ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে তিল মাত্র দেরি না করে টিকেট করে ফেলেন অনেকে।

টেমস নদীতে নৌ ভ্রমণের অফার দিয়েও কম প্রতিযোগিতা হয় না দুই কম্পানির মধ্যে। তুলনায় আমাদের অফার ভালো বলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জিত হয় আমাদেরই। আমাদের একটি ট্রিপ হচ্ছে ওয়েস্টমিনস্টার পিয়ার থেকে টাওয়ার ঘুরে আবার পূর্ব স্থানে ফিরে আসা সার্কুলার ট্রিপ যা স্থায়ী প্রায় ঘণ্টা খানেক। আরেকটি হচ্ছে, এমব্যাকংমেন্ট পিয়ার থেকে একেবারে গ্রিনিচ পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা স্থায়ী। বিগ বাসের মাত্র বিশ মিনিট স্থায়ী ওয়ানওয়ে ট্রিপ। কাচ ঘেরা চওড়া এই বোটগুলোতে ইংরেজিভাষী গাইডের ধারাবর্ণনা রয়েছে। অন্য ভাষাভাষীদের জন্য রয়েছে রেকর্ডেড কমেন্ট্রি। নদী থেকে লন্ডনের ভিন্ন রূপ সত্যিই আকর্ষণীয়। পর্যটকরাও তা উপভোগ করেন তারিয়ে তারিয়ে। ক্রুজ শেষে হাসি মুখে সবার নেমে আসা দেখেই বোঝা যায় তা। ক্রুজ কম্পানিগুলোর বুকিং অফিসে পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে সারাক্ষণ। বিশেষ করে আবহাওয়া যেদিন থাকে ভালো।

বোট ক্রুজ ছাড়াও রয়েছে অনেক ভাসমান রেস্টুরেন্ট। যেগুলোতে নৌ ভ্রমণসহ লাঞ্চ বা ডিনার সারা যায় ডেকে বসে। অথবা রাতে কিংবা উইকএন্ডে বোটগুলোতে পার্টির আয়োজন হয় বিভিন্ন ক্লাব বা অফিস ইত্যাদির পক্ষ থেকে। টেমসের তীরে রয়েছে এছাড়াও অনেক পাব যেখানে বসে টেমসের সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি ড্রিংক করে লোকেরা। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে পাবগুলো। টেমসের বাধানো দুই তীরে রয়েছে চওড়া ফুটপাথ বা যেখানে পার্ক রয়েছে সেখানে পায়ে হাটার পথ। এরা বলে টেমস পাথ। কোথাও এসব পাথের ধারের বেঞ্চিতে বসে লোকেরা ঘুমাচ্ছে বা বই পড়ছে অথবা বিশ্রাম নিতে দেখা যায়। কোথাও দেখা যায় পর্যটকের দল ছবি তুলতে ব্যস্ত। টেমসের তীরের পার্কগুলোতে দেখা যায় জাদুসহ নানান কায়দা–কসরত দেখানো ব্যক্তিদের ঘিরে ছেলে–বুড়োদের মাতামাতি। কেউ বা রোদ উপভোগে ব্যস্ত। তরুণ–তরুণীরা ব্যস্ত ভালোবাসাবাসিতে।

টেমস নদীর বর্তমানে আরেক গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ হলো *লন্ডন আই*। চারশ বত্রিশ ফিট উচু বিশ্বের সর্ববৃহৎ অবজারভেশন হুইলে চড়ার জন্য মানুষের সে কি উৎসাহ আর ব্যস্ততা! পাশেই সাররিয়ালিজমের জনক সালভাদর ডালির ভাস্কর্য মন কাড়বে যে কারোরই। জাদুকর এবং সার্কাসের বাজিকরদের ঘিরে পর্যটকদের হট্টগোল টেমসের এই তীরকে মাতিয়ে রাখছে সব সময়ই।

আমাদের পর্যটন কর্পরেশনের মেরি এন্ডারসনের বুড়িগঙ্গা ভ্রমণে এ ধরনের কিছু দেখা যায় না। এই বুড়িগঙ্গার দুই তীরে ইটভাটা, কারখানা আর পানিতে তাদের বর্জ্য পদার্থ ছাড়া আর দেখার কি–ইবা আছে – আমাদের এতো বিপুল নদী এবং নদী সম্পদ! আমরা তা ব্যবহার করতে ব্যর্থ হচ্ছি। যেখানে টেমস থেকে বৃটিশ সরকার কামিয়ে নিচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ, হচ্ছে বিপুল লোকের কর্মসংস্থান সেখানে দুঃখ হয় আমাদের নদীগুলোর সঙ্গে তুলনা করে। প্রকৃতি আমাদের অবাধে দিলেও তা আমরা অবোধের মতো হেলা ভরে পায়ে ঠেলে চলেছি প্রতিনিয়ত। নদীগুলো দখল হয়ে যাচ্ছে স্বার্থলোভী ব্যক্তিদের হাতে। টেমসকে কোন অসভ্য বর্বর দখল করে তীরের মালিকানা নিয়ে এর গলা টিপে হত্যা করছে এ রকম বাস্তবে ঘটা তো দূরের কথা, কল্পনাও অসম্ভব। বাস্তবসম্মত আইন এবং কঠোর প্রয়োগ এ দেশে এ ঘটনাকে করেছে অসম্ভব। সে তো আমরাও পারি। একটি সঠিক রিভার পলিসি এবং ম্যানেজমেন্ট গড়ে তোলা তো খুব কঠিন কাজ নয়, দরকার শুধু মানসিকতা ও দূরদৃষ্টির।

টেমস আজ লন্ডনকে যা দিচ্ছে তা আমাকে আশ্চর্য করলেও ততোধিক আশ্চর্য হয়েছি কিছু দিন আগেও টেমস একটা মজা নদী ছিল বলে শুনে। টেমসের পানি ছিল এতো দূষিত যে, কোনো মাছ ছিল না সেখানে।

১৯৬৮ সালে মেয়র অফ লন্ডনের উদ্যোগে টেমসকে পুনর্জীবিত করে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফলে নবজীবন ফিরে পেয়েছে টেমস। আমাদের ঢাকার মেয়র কি তেমন উদ্যোগ নিয়ে বুড়িগঙ্গাকে বাচিয়ে তুলবেন? তিনি তো মৎস্যমন্ত্রীও ছিলেন। নাকি এখন ওটা তার ডিপার্টমেন্টের কর্ম নয় বলে হেলা ভরে এড়িয়ে যাবেন?

পরিশেষে আরেকটা কথা বলি। টেমস আমাকে মুগ্ধ করে দুই কারণে। এর স্রোতের শব্দে আমি শুনি টাকার আওয়াজ। শুধু নদীতে নৌকা চড়ে আর বোট রেস্টুরেন্টে খেতে এসে স্রোতের মতো টাকা খরচ করছে লোকেরা এবং টেমসের মাধ্যমে তা কামিয়ে নিচ্ছে বৃটেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, টেমসে রবার্ট ক্লাইভ আত্মহত্যা করে পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করেছে বলে টেমসের দিকে তাকাই মুগ্ধ চোখে।

এসব উদাহরণ যেন আমাদের সংশ্লিষ্ট রাজনীতিকসহ সরকারি দায়িত্বশীল কর্তাব্যক্তিদের বোধোদয় ঘটায়। আমাদের নদীগুলোও যেন ভাগ্য পরিবর্তনকারী সম্পদে পরিণত হয়। না হলে হয়তো আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও অভিশাপ দেবে যাতে নদী সম্পদ ধ্বংসের জন্য সংশ্লিষ্টদেরও যেন ক্লাইভের নদীতে ডুবে মরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

লন্ডন থেকে

রোম জয়

- জোনায়েত হোসেন

সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে ইটালির রোম নগরী। বিশ্বের একটি সমৃদ্ধ শহর। নৌকায় করে বাংলাদেশ থেকে রোম নগরীতে পৌছানো যাবে না তা জেনেই রোম জয়ের অভিযানে নামলাম। বর্ষাকাল, অথচ বৃষ্টিহীন এক শুক্রবার আমার স্বপ্নের রোম জয়ে নৌকায় যাত্রা শুরু করলাম। আমার রোম ছিল রুমা নামের এক সদাহাস্যোজ্জ্বল, লাবণ্যময়ী, চঞ্চলা, মুক্তা ঝরানো অপরূপ হাসির অনবদ্য এক ষোড়শী।

গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে স্রোতস্বিনী পদ্মার শাখা নদী ভৈরব। দুই তীরের ছোট সবুজে ঘেরা গ্রাম। কোথাও ইট–পাথরের অট্টালিকা, শিল্প কারখানা ছাপিয়ে আপন বেগে ভৈরব ছুটে চলেছে অজানা গন্তব্যে। বর্ষার ভৈরব যেন পূর্ণ যৌবনা। আজ বাধাহীন গতীতে ছুটে চলা নদীটির চেহারা অন্যভাবে ধরা পড়েছে আমার চোখে। কতো শতবার এ নদী পার হয়েছি, নৌকায় করে ঘুরেছি, অথচ আজকের মতো এতো রূপ লাবণ্য, টইটম্বুর অবস্থা আমার চোখে ধরা পড়েনি কোনোদিন। কেন আজ এমন হচ্ছে? কারণটা হলো ওই রোম। আমার মনের রাজ্যের রাজধানী।

রুমা আমার ছাত্রী রোজিনার ছোট বোন। ক্লাস টেনের ছাত্রী। দেখতে আহামরি না হলেও সে আমার মনের রানী, আমার তপস্যার ধন। সার্বক্ষণিক মনের মাঝে বিচরণকারী এক পরী।

বড় বোনকে পড়াতে গিয়ে পরিচয়। সেখান থেকে বইপত্র নিয়ে পড়ার টেবিলে বসে শিষ্যত্ব গ্রহণ। একে একে ভালো লাগা, ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়া।

কোনো এক শুক্রবার দুজনে ছইওয়ালা নৌকায় উঠে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে বের হলাম। মাঝি চল্লিশোর্ধ লাভু মিয়া। গরুর কবিরাজ ছিল বাবা। এ জন্য তার গর্বের সীমা নেই। নিজের এই বিশাল (তার বর্ণনার ভঙ্গিতে) পরিচয় তার আত্মতুষ্টির একটি কারণও বটে।

রসিক মাঝি আমাদের দুজনকে দেখেই বুঝেছে প্রেমের জ্বালা সপ্তমে পৌছানোর খেসারত আমাদের এ ভ্রমণ। বার বার সে বলছে, কোন দিকে যাবো।

আমরা কোথায় যাবো সে গন্তব্য যে ঠিক করিনি! নৌকা ভ্রমণের নামে আমার ভালোবাসার মানুষের একান্ত সান্নিধ্য চেয়েছি আমি। আমার রোম চেয়েছে আমাকে একান্ত করে পেতে। সেই চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার আনন্দ আমাদের গন্তব্য নির্ধারণে বাদ সেধেছে।

লাভু মিয়া অবশ্য তা বুঝে নিজেই গন্তব্য ঠিক করে উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করে দেয়।

আমি আর আমার রোম, নৌকায় মাঝি নামের কোনো প্রাণীর অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারছি না। নৌকা চলছে। পানির ঢেউয়ের কুলে কুল ধ্বনি, বৈঠা চালানোর ছলাৎ শব্দ কোনো কিছুই আমার কানে আসছে না। শুধু পাচ্ছি রোম সাম্রাজ্যের ষোড়শীর নিঃশ্বাসের শব্দ। রোম আমার প্রেম, আমার অস্তিত্ব, আমার অনাগত শত সহস্র স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু। বর্ষার নতুন পানিতে প্রকৃতি যেমন সবুজের অপরূপ শোভায় সেজেছে, আমার রোম সেজেছে তেমনি অকৃত্রিম সাজে। তাকে জড়িয়ে ধরে মনে হচ্ছে কদম ফুলের সুগন্ধী আমার সারা দেহ মন অপার আনন্দে ভরিয়ে দিচ্ছে। এতো কথা বলছে, অথচ কোনো কথার অর্থ খুজে পাচ্ছি না।

তাকে কেমন দেখাচ্ছে, শাড়ি পরলে কেমন লাগতো, কোন রঙয়ের ব্লাউজ বেশি মানাবে, ব্রা-র কালার কেমন হবে ইত্যাদি যতো প্রশ্ন আছে করতে থাকলো অনর্গল।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেই চলেছি। অনার্স পাস করে সহজ-সরল, বাস্তব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ মেয়েটির জাদুমাখা ভালোবাসার নদীতে অবগাহন করছি। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, আমি কি আমার রোমের সরল অথচ গভীর প্রেম মাখা প্রশ্নের উত্তরগুলো মমার্থ বুঝি? এক ফাকে প্রশ্ন করলাম, আমাকে যদি তার বাবা-মা জামাই করতে না চায় তাহলে কি করবে?

সাফ জবাব এলো, আত্মহত্যা করবে।

তাকে গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরি। কতোক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। হঠাৎ একটি ইঞ্জিন নৌকা পাশ দিয়ে চলে গেলে সংবিৎ ফিরে পাই। দেখি দুজন দুজনার বাহুডোরে বাধা। তার চোখের পানি মুছে দিই।

এ অশ্রু নাকি আনন্দের। রোম বললো।

সকালের সূর্যটা কখন যে মাথার উপর নিয়ে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে তাও বুঝতে পারলাম না। দুপুরের জন্য স্যান্ডউইচ, কোক ও হালকা অন্যান্য খাবার ছিল। মাঝিকে দিলাম অর্ধেক। বাকিটা দুজনে খেলাম। রোম আমাকে তুলে খাওয়াবে। আমিও একই কথা বললাম। শেষে তার কাছে হার মেনে শান্ত ছেলের মতো বসে থাকলাম। কোনো সময় হাত দিয়ে আমাকে কখনো বা নিজের মুখে দিচ্ছে।

দুপুরের খাবার শেষে ফেরার পালা।

লাভু মিয়া এবার বলে উঠলো, মিয়া-বিবি তো রাজি। কিন্তু বাড়ির লোকজন জানে এসব?

রোম বললো, না।

মাঝি পরামর্শ দিয়ে বললো, প্রেমের মরা জনমের মরা। বাচতে চাইলে বিয়ে করে ফেলো।

এ কথা শুনে আমার রোম পুলকিত হলো বটে কিন্তু আমার গলা শুকিয়ে গেল। প্রেম করলে যে বিয়ের কথাও ভাবতে হয় তা তো চিন্তা করিনি। মাঝিকে বললাম, আমার পড়ালেখা শেষ হতে এখনো এক বছর বাকি। চাকরি করে নিজের পায়ে দাড়াবো, তারপর বিয়ে নিয়ে ভাববো।

এতোক্ষণে রোম পুড়তে শুরু করেছে। আমার সাধের নৌকা ভ্রমণ মাথায় ওঠার উপক্রম। শুধু বলছে, কোনো কিছুই জানি না, এসএসসি পরীক্ষার পর আমি আর বাপের বাড়ি থাকবো না। বৌ করতে যা যা লাগে তার ব্যবস্থা করতে থাকো।

রোম নগরী পোড়ার সময় শুনেছি সম্রাট নিরো হার্প বাজিয়েছিল। আমার হার্প বাজানো তো দূরের কথা, সারা শরীর যেন অবশ হয়ে আসতে লাগলো।

মাঝি ব্যাটা আমার অবস্থা দেখে পরামর্শ দিয়ে বললো, আগে এমএ পাস করো, তোমার বৌ এসএসসি পাস করুক। তারপর বিয়ের চিন্তা করো। ভয় পেয়ে লাভ নেই। চাকরি হয়ে যাবে।

যে চিন্তা সেই কাজ। রোমকে কথা দিলাম।

সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। মাঝির সামনে আমার ঠোটে চুমু দিতে লাগলো।

আমি বাধা না দিয়ে তার ঠোটে চুমু দিলাম। নৌকা ভ্রমণে রোম জয় করলাম।

এখন আমার রোমের নরম বুকে মাথা গুজে গভীর মমতায় ভালোবাসার জয়গান করছি।

বসুন্দিয়া, যশোর থেকে

টিঙিউথার হাওরে আন্দাউলা

- ইমদাদ সিয়াধার

আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি ছিল হিন্দু। কুলীন ব্রাহ্মণ। তার নামটিও ছিল শ্রুতিমধুর। তেত্রিশ বছর আগের কথা। আজ পর্যন্ত এ নামের কারো কথা শুনিনি। এখানে তার নাম লিখছি লাবনী। এটি লুকানো নাম।

তখন জুলাই মাস। আষাঢ়ের শেষ দিক। ভরা বর্ষা। পাক আর্মিরা রাজাকারদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের এলাকা ঘেরাও করে ফেলেছে। গুলি, বেত্রাঘাত, লুটতরাজ, হত্যা সবই হয়েছে। যাবার বেলায় কয়েকজন উঠতি বয়সী মেয়েকে ধরে নিয়ে যায়। তার মাঝে লাবনীও ছিল। রাজাকার কমান্ডার নওয়াব আলী। এটিও লুকানো নাম। আমার বুকের পাটা এতো শক্ত নয় যে, আজ তার আসল নাম লিখবো। সে নাকি সুন্দরী মেয়েদের একটি লিস্ট করেছিল। সেখানে লাবনীর নামটি ছিল প্রথম।

কয়েকজন মেয়েকে ওরা নিয়ে যায়। তাদের হদিস কোনোদিন পাওয়া যায়নি। তবে লাবনীর হদিস পাওয়া গিয়েছিল।

মোহনগঞ্জ থানা ক্যাম্পে দিন কয়েক অতিবাহিত হওয়ার পর শান্তি কমিটির আবুল হোসেন শেখ সাহেবের সহায়তায় কোনো এক শুক্রবার বিকেলে লাবনী মুক্তি পায়। মুক্তি পাওয়ার পেছনে বিশেষ কারণ ছিল তার অসুস্থতা। লাবনী বিশ্রী রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে। যার বিবরণ মুদ্রণযোগ্য নয়।

খবর পেয়ে লাবনীকে দেখতে যাই।

অনিবার্য পরিস্থিতিতে দেখা করতে দেয়া হয়নি।

মাথা নিচু করে চলে এসেছিলাম।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভ্রাম্যমাণ দোকানদারি করেছি। পরদিন শনিবার নৌকাযোগে লেপশিয়া (খালিয়াজুরী থানা) বাজারে যাই। আমি, ফৌজদারকাকু (তারও একটি দোকান ছিল), মাঝি হিসেবে সহরচাচা, কাচুচাচা ছিলেন। শেষোক্ত দুজন আজ আর বেচে নেই।

লেপশিয়া বাজারে কেনা বেচার সময় ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টা। সন্ধ্যার আগেই নৌকায় আগত ক্রেতা–বিক্রেতারা নিজ গন্তব্যে রওনা হয়ে যেতো। তখন যান্ত্রিক নৌযান ছিল না। দাড়, বৈঠা, লগি (বাশের লম্বা খুটি), পাল ছিল চালিকা উপাদান।

শনিবারে *শনির দশা লাগে*। লেপশিয়ার হাটবার ছিল শনিবার। উত্তাল টিঙিউথার হাওর পাড়ি দিতে বুক কেপে উঠতো। সেদিন দুপুরের পর থেকে প্রথমে পিট পিট বৃষ্টি, তারপর থেমে থেমে ঝড়ো হাওয়া, হাওর যেন পাগলা হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার আগেই আবহাওয়া ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। এরপরও বাড়ি আসতে হবে, ঝুকি নিয়েই আমাদের নৌকা ছেড়ে দিলাম। বরান্তর পেরিয়ে টিঙিউথার হাওরে পড়তেই আফালের জোর বেড়ে গেল। আফাল হলো প্রবল ঢেউ ও ঝড়ো হাওয়া। কোনো ভাবেই সুজাসুজি হাওর পাড়ি দিতে পারছিলাম না। ঢেউ–এর দোলায় নৌকা ডুবে ডুবে অবস্থা।

সহরচাচা খোয়াজখিজিরের দোহাই দিচ্ছিলেন চিৎকার করে *ইসলামি শরীয়তে যা সমীচীন নয়*।

কাচুচাচা তবদা (স্থির) হয়ে চারী (হাল) ধরে বসেছিলেন।

ফৌজদারকাকুর চোখ ছল ছল করছিল।

আমারও তখন মায়ের মুখ, ছোট ভাইবোনদের মুখ–চোখে ভাসতে লাগলো। সোজা পথ ছেড়ে আমাদের নৌকা চালাতে হলো যাত্রাপথকে নব্বই ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে। ঢেউয়ে নৌকা আচাড় খেতে খেতে শ্যামপুরের দিকে এগোচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতর পড়ে গেলাম। তারকারাজির ধারণা ও দিক নির্ণয়ের কৌশল জানা থাকার পরও সব অসার হয়ে গেল। আমাদের নৌকা প্রবল ঝড়ো হাওয়া ও ভীষণ ঢেউয়ের বুক চিড়ে কোনদিকে যাচ্ছে নিজেরাই বুঝে উঠতে পারছি না। আমাদেরকে আন্দাউলায় ধরেছে (আন্দাউলা হলো দিক ভ্রম)।

সারা রাত শরীর ও মনের ওপর বেজায় কষ্ট যাওয়ার পর শেষ প্রহরে আন্দাউলা কেটে গিয়েছে। আমরা হানবীরের খালের মুখে পড়েছি। কিছুটা এগোতেই শান্ত খাল, বাতাসের ঝাপটাও কমে এসেছে।

সহরচাচা বৃষ্টিতে ভিজে কাপতে লাগলেন।

কাপুনি আমাদেরও ছিল। সহরচাচার কাপুনি নিরাময় হয় বিড়ি ফুকে। কিন্তু আমাদের নৌকায় আগুন ছিল না। কাচু চাচার কোচরে (কোমরে লুঙির ভাজে) দিয়াশলাই ছিল যা ভিজে গিয়েছে।

পাশেই আরেকটি নৌকা ফারা দেয়া ছিল (ফারা হলো নোঙ্গর করা)। আগুন আনতে গিয়ে ওই নৌকায় উঠলাম। হারিকেনের মৃদু আলোয় প্রথমেই যে মুখটি দেখতে পেলাম তাতে আমার বুকের রক্ত যেন জমাট বেধে গেল। কোনো কথাই বলতে পারছিলাম না। সে কাথা বা এমনতর কিছু গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। নজরকাড়া সৌন্দর্যের মাঝে যেন কালির ছোপ পড়েছে।

আমার হাতে তার হাতটি রাখলো।

নৃপেনকাকা ও অন্যান্যরা নির্বাক যেন পাথরে মূর্তি।

তার গা গরম, জ্বর জ্বর লাগছে। ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইলো।

দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। লাবনীর অভিভাবকেরা চেয়েছিলেন ইনডিয়ার কোথাও তাকে পাত্রস্থ করার জন্য। সে গো ধরেছিল দেশে ফিরে আসবে বলে।

তাকে বোঝানো হয়েছিল, পাক আর্মির ধরে নেয়া মেয়েকে কেউ ঘরে তুলবে না। এসবই শোনা কথা।

আরো শুনেছিলাম, সে নাকি বলেছিল, কেউ ঠাই না দিলে খোকা ভাইয়ের কাছে চলে যাবো (খোকা আমার ডাক নাম)।

লাবনীর মৃত্যু সম্পর্কীয় রটনাগুলো এ রকম –

এক. তার অভিভাবকেরা তাকে মেরে ফেলেছে।

দুই. সে বিষ পানে আত্মহত্যা করেছে।

তিন. ডায়ারিয়ায় সে ইহলোক ছেড়েছে।

লাবনীর মৃত্যুর জন্য কে দায়ী?

স্বাধীনতা, না আমি?

নাকি আন্দাউলা?

শেষ দেখায় তাকে বলেছিলাম, সকল মানুষ তোমাকে ঘৃণা করলেও আমি তাতে নেই।

ভোর রাতের আকাশ ছিল সে কথার সাক্ষী।

খুরশিমুল, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা থেকে
sheadhar_bd@yahoo.com

সুরভী- ছয়

- শাহীন ইকবাল

বরিশাল বিভাগ অঞ্চলে যাদের বাড়ি তারা *সুরভী–ছয়* লঞ্চে চড়েননি বা নিদেনপক্ষে এর সুনাম শুনেননি এমন একজনকেও খুজে পাওয়া যাবে না। সহস্রাধিক যাত্রী পরিবহনের এ লঞ্চটি তার বিশালত্বই নয় বরং আভিজাত্য ও বিলাস বহুলতার জন্যও ইতিমধ্যে দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীদের মন জয় করে নিয়েছে। প্রায় তিন তারা পর্যায়ের হোটেল রুমের মতো দুটো ভিআইপি রুম, বেশ কিছু এসি ও নন–এসি ক্যাবিন, প্রথম এবং দ্বিতীয় তলার শতাধিক সোফা কাম বেড সব কিছুই যেন তৈরি স্বপ্নময় জলযাত্রার জন্য আর রয়েছে বিশাল একটি ছাদ। এ ছাদে কোনো এক পূর্ণিমা রাত কাটানো যেকোনো প্রকৃতি প্রেমিকের জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠতম স্মৃতি হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে।

আমাদের পরিবারের সবাই বা আমি একা যেকোনো কারণে বরিশাল গেলে যেদিন *সুরভী–ছয়* থাকে সেদিন যাবার প্রোগ্রাম ঠিক করি। বরিশাল থেকে ফেরার সময়ও একইভাবে প্রোগ্রাম সেট করা হয়।

উল্লেখ্য, সুরভী–ছয় একদিন পর পর ঢাকা থেকে ছেড়ে যায় আবার পরদিন বরিশাল থেকে ছেড়ে আসে। ঝড়বৃষ্টির দিনে বিশাল আকারের লঞ্চটি মনে অনেকটাই সাহস যোগায় নৌযাত্রায়। এখানকার রেস্টুরেন্টের খাবারের স্বাদও অন্য রকম। বিশেষ করে ডাল ভুনার কথা মনে থাকবে অনেক দিন।

এসবের বাইরে আমার কাছে অবশ্য সুরভী ছয়–এর আবেগ, আকুলতা অন্য কারণে। এ লঞ্চেই ২০০২ সালের ডিসেম্বরে আমার বরযাত্রার আয়োজন করা হয়। দুটি ভিআইপি রুম, পনেরো ষোলটি ক্যাবিন আর বেশ কিছু সোফায় করে আমরা কলিগদের নিয়ে সারা রাত খুব মজা করি লঞ্চে। এ মজায় আমাদের সঙ্গে শরিক হয় সুরভী–ছয় কর্মীরাও। তারা লঞ্চের বিশাল ডাইনিং হলটি খুলে সাজিয়ে দেয় আমাদের পরিবারের সদস্যদের গান–বাজনা ও খাওয়া–দাওয়ার জন্য। একটু পর পর খোজখবর নিতে থাকে কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কি না।

সারা রাত মজা করে খুব সকালে বরিশাল পৌছেও দুপুর বারোটা পর্যন্ত লঞ্চেই থাকি এবং সবাই গোসল করে রেডি হয়ে রওনা দিই বিয়ের আসর *ফারিয়া কমিউনিটি সেন্টার*–এ। হই চই, খাওয়া–দাওয়া আর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে নবপরিণীতা স্ত্রী রুমাকে নিয়ে আবার ফেরা সেই সুরভী–ছয়–এ।

রাতের খাওয়া–দাওয়া শেষ করে সবাই মিলে আড্ডায় বসলাম লঞ্চের ছাদে। সঙ্গে চললো গান–বাজনা, কৌতুক আর নাচ। এবার ঘুমানোর পালা।

একটি ভিআইপি ক্যাবিনে বাসর সাজানো হলো। ক্যাবনটিতে ছিল একটি ডাবল খাট, একসেট সোফা, আলমারি, এটাচড বাথ আর ছোট এক চিলতে বারান্দা যেখানে বসে নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। আমরা রাত একটার দিকে রুমে যাবার সুযোগ পেলাম। দুজনে কাপড় বদলে লাগোয়া ব্যালকনিতে ঝকঝকে চাদের মায়াবী আলোতে রাত প্রায় দুইটা পর্যন্ত বসে গল্প করলাম। আমার বাসর হলো সুরভী–ছয় লঞ্চে।

খুব সকালে উঠে সবাই মিলে কাজীপাড়ার বাসায়।

এসব কারণেই সুরভী–ছয় আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে থাকবে চিরদিন।

মতিঝিল, ঢাকা।

বহির্নোঙ্গরে

আমরা যারা সি কাস্টমসে সিঅ্যান্ডএফ অর্থাৎ কাস্টমস ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টের কাজ করি তাদের বহির্নোঙ্গরে (আউটার) জাহাজে যাওয়া অপরিহার্য। বিশেষ করে সারের (ফার্টিলাইজার) জাহাজে কাস্টমসের দুইজন পৃন্সিপাল অ্যাপ্রেইজার ও সঙ্গে দুইজন কৃষি অফিসার নিয়ে যেতে হয়। উক্ত চারজনের কাজ

হচ্ছে জাহাজ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে কেমিকাল টেস্টের জন্য পাঠানো। অর্থাৎ মালামালের পিএসআই (Pre Shipment Inspection) সার্টিফিকেটের স্পেসিফিকেশন্স এবং একচুয়াল রেজাল্টস–এর সঙ্গে মিল আছে কি না। চারজন অফিসারকে জাহাজে নিয়ে যাওয়া, খাওয়ানো, বাড়ি পৌছে দেয়া, নগদ নারায়ণ প্রদান সব সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট করে থাকে।

চট্টগ্রামের ১৫ নাম্বার জেটি থেকে স্পিডবোট নিয়ে জাহাজে যাওয়া সহজ হলেও মংলায় এই সুবিধা নেই। কিন্তু মংলা থেকে আট দশজনের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জালিবোট বা ট্রলার নিয়ে হারবাড়িয়া, হিরণ পয়েন্ট যাওয়ার মজাই আলাদা।

একবার আমাদের জাহাজ MOP (Muriate Of Potash) সার নিয়ে মংলা বন্দর থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে (আলফা–১৬) হারবাড়িয়া অবস্থান করছিল। নিয়ম অনুযায়ী চারজন অফিসার নিয়ে মংলা থেকে জালিবোটে রওনা হলাম। সুন্দরবনের পাশ ঘেষে বোট চলছিল। নতুন দুই কৃষি অফিসার সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বনের মধ্যে হেটে বেড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে সময়ের অভাবে কেউ রাজি হলাম না। একপাল হরিণ দেখে দুজনেই চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

পাচটার দিকে জাহাজে উঠতেই গৃক চিফ অফিসার ও ইন্ডিয়ান ক্যাপটেন আমাদের ওয়েলকাম জানিয়ে রুমে নিয়ে গেলেন। কোল্ড ড্রংকস, বিস্কিট ছাড়াও সবাইকে দুটো করে বিয়ার দিলেন।

দুই কৃষি অফিসার মুহূর্তে বিয়ার শেষ করে ইশারায় আমাকে বোতলের কথা বলতেই বিচক্ষণ ক্যাপটেন ফোন করে একটা হুইস্কির বোতল আনালেন।

দুইজনের মদ খাওয়া দেখে আমরা বিব্রত বোধ করলে ক্যাপটেন আমাকে ডেকে হেসে হিন্দিতে বললেন, *ক্যায়া আপ হামারা বাচ্চো কে লিয়ে কুছ বাংলাদেশকা সিক্কা (মুদ্রা)–দে সেকতা হ্যায়?*

বললাম, ইয়েস আই হ্যাভ বাই মাই পৃভিয়াস এক্সপেরিয়েন্স। আই হ্যাভ কাম উইথ সাম বাংলাদেশি কয়েন্স উইথ মি। ফর ইওর কিডস।

চিফ আর ক্যাপটেন ভীষণ খুশি হয়ে মুদ্রাগুলো ভাগ করে নিয়ে আমাকে ছোট একটা কাচের টি টেবিল গিফট দিলেন।

হ্যাচ খুলে সারের স্যাম্পল নিয়ে এবার ফেরার পালা। কিন্তু দুই কৃষি অফিসারকে পাওয়া গেল না। খোজ করতেই চিফ অফিসার আমাকে ডাইনিংরুমে নিয়ে গেলেন। দেখলাম দুইজনে রুটি, চিকেন সবজি শেষ করে আস্ত একটা ভেটকি মাছের ফ্রাই মজা করে খাচ্ছেন। বোতলটা ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছেন প্রায়ই।

বললাম, স্যার, চলুন আর খাবেন না, পথে সমস্যা হতে পারে।

একজন মুড নিয়ে বললেন, ডোনট ওয়ারি। উই আর কোয়াইট নরমাল।

চিফ আমাকে বললেন, নো, টু অফিসার্স আর ফুললি ইনটকসিকেটেড।

লজ্জা পেয়ে চিফকে বললাম, স্যার, দিজ ইজ দি রিয়াল পজিশন অফ বাংলাদেশি এগৃকালচার অফিসার।

ক্যাপটেন এসে তাদের মাছ খাওয়া দেখে আমাকে টিজ করে বললেন, *মালুম হোতা হ্যায় কে এই দোনো অফিসারকো মছলি সে ভুক নেহি মিটে গা। এ লোগকো কুছ মাটন দেংগে?*

কথা না বাড়িয়ে সবাই দ্রুত নিচে নেমে বোট ছাড়ার নির্দেশ দিলাম। ডিউটি শেষে কোস্টগার্ডের দুই সদস্য অস্ত্রসহ আমাদের বোটে মংলা ফিরছিলেন। পথিমধ্যে ডাকাতের ভয় থাকলেও সেটা কেটে গেল।

ঢেউয়ের তোড়ে বোট যখন দুলছিল, দুজনেই ইতিমধ্যে খাওয়া খাবারগুলো গলা দিয়ে বের করে দিলেন। দুজনকে নিচে শুয়ে থাকার কথা বলে আমরা বোটের ছাদে বসলাম।

রাত আটটার দিকে বানিয়া শান্তা পতিতাপল্লির একটা ঘাটে বোট বেধে চালক জানালো, ডিজেল শেষ।

এখান থেকে মংলা ঘাট দুই কিলোমিটার।

বোটের দুজনই ক্যান নিয়ে চলে গেল।

একদল মেয়ে বোটের কাছে এসে জড়ো হয়ে আকারে–ইঙ্গিতে আমাদের নামার অনুরোধ করলে পি.এ. স্যার বললেন, আমরা অন্য কাজে এসেছিলাম।

স্যার দুইশ টাকা একটা মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন, তোমরা যখন আশা করে এসেছো, এই টাকা দিয়ে সবাই নাশতা খাবে।

টাকা নিয়ে সবাই হুড়োহুড়ি শুরু করলো। ডিজেল ঢেলে বোট ছেড়ে দেয়া হলো।

স্যার অসহায় মেয়েগুলোর কথা আলোচনা করছিলেন আমাদের সঙ্গে। হঠাৎ ঘাট থেকে কিছু মহিলা–পুরুষ সমস্বরে চিৎকার করে আমাদের থামতে বললো।

ভাবলাম আমাদের কেউ হয়তো ওখানে থেকে গেছে। নিচে নেমে দেখি দুই অফিসার ঘুমে অচেতন। সবাই আছি।

চালক বোট থামিয়ে দিলে বোটের টয়লেট থেকে সুশ্রী একটা মেয়ে কান্নাকাটি করে বললো, আপনারা আমার বাবা, আমার ভাই। আমাকে বাচান। বিশ্বাস করুন আমি খারাপ নই।

কোস্টগার্ডের দুই সদস্য দ্রুত বোট চালানোর নির্দেশ দিলেন।

হালকা আলো–আধারিতে মেয়েটা কখন টয়লেটে আশ্রয় নিয়েছিল আমরা কেউ টেরই পাইনি। ভয়ে কাপছিল সে। কোনো রকমে বললো, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

আমরা তখন মাঝ নদীতে চলে এসেছি।

বোটের হেলপার ছাদে উঠে আমাদের জানালো, স্যার, মেয়েটাকে তাদের কাছে ফেরত দিয়ে দিন। ওই দেখুন তারা লাঠি–কিরিচ নিয়ে আসছে।

সত্যি তাই! একটা ইঞ্জিন নৌকা নিয়ে কিছু লোক আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

ভয় পেয়ে গেলাম আমরা।

প্রচণ্ড কান্না শুরু করলো মেয়েটা।

দুই কোস্টগার্ড সদস্য হেলপারকে ধমক দিয়ে অস্ত্র তাক করে দাড়ালেন।

নির্বিকার তারা। চিৎকার করে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে!

নৌকাটা বোটের পঞ্চাশ ফিট কাছে আসতেই বিকট শব্দে ফায়ার করলেন এক সদস্য।

ইঞ্জিন বন্ধ করে নৌকাটা পানিতে ভাসতে থাকলো। একটু পরেই ফিরে গেল তারা।

হাফ ছেড়ে বাচলাম সবাই।

মংলা পৌছে অচেতন দুই অফিসারকে জাগানো সম্ভব হলো না। আমাদের একজনকে রেখে ওই মেয়েসহ খুলনা ফিরে এলাম। মেয়েটাকে তার বাড়িতে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন পি.এ স্যার এবং সেটা পালনও করেছিলেন তিনি।

নাম ঠিকানা বিহীন, খুলনা থেকে

জলসীমা

– জাকির

বাইরে ঝম ঝম বৃষ্টি। বাতি নিভিয়ে চেয়ারটা জানালার কাছে টেনে বসে বাদল। সারা দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর গোসল, খাওয়া–দাওয়া সেরে ঘুমাতে যাবার আগে এই সময়টা সামনের ঘাসে মোড়ানো উঠোনের পাশে বড় পাথরটার ওপর বসে রাতের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে স্মৃতি রোমন্থন করে সে।

দুদিন ধরে বৃষ্টি হওয়ার কারণে ঘরেই বসতে হচ্ছে। অন্ধকার জানালায় বসে স্মৃতিচারণ, তাও মন্দ নয় বৃষ্টির রাতে। স্মৃতিরই বা কি আছে! মাত্র চার বছর হলো এই পাহাড়–পাথর আর যন্ত্রের দেশে কোরিয়াতে এসেছে বাদল। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ আরো একটা শব্দ প্রবল হয়ে ওঠে। অন্ধকারে দূরে পাহাড়টার পেট ফুটো করে যান্ত্রিক গর্জন তুলে বেরিয়ে আসে কোরিয়ার আধুনিক ও দ্রুততম এবং সম্ভবত বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেনটা, নিমেষেই আবার অন্য একটা পাহাড়ের সুড়ঙ্গে হারিয়ে যায়। এদিকটায় বসতি কম হওয়ায় দূর থেকেও এই দৃশ্যটা দেখা যায়। একটু পর পরই সুড়ুত করে ট্রেনগুলো চলে যায় বুসান থেকে সিউল, সিউল থেকে বুসান। আগামী গরমের ছুটিতে যেতে হবে বুসান ভাবে বাদল।

সমুদ্রে ঘেরা স্বপ্নপুরী। দুই বছর আগেও অবশ্য গ্রীষ্মের ছুটিতে ঘুরে এসেছে ওখানে। কিন্তু তখন এই ট্রেনটা চালু হয়নি। তখন ছয় ঘণ্টার পথ। এখন দুই ঘণ্টা। অন্ধকারেও স্পষ্ট চকচক করে ওঠে বাদলের চোখ দুটো। নীল সাগরের তীরে রঙিন ছাতার নিচে বিকিনি পরা ঝাক ঝাক লাল পরী নীল পরীর দল। বিয়ারের গ্লাসের ছলকানি। ফ্রাই করা মুরগির ঠ্যাং, ওহ! রাতের সাগরে আতশবাজির উৎসব, খোলা বিচ জুড়ে বিশাল স্টেজে ওপেন কনসার্ট–এর আলো আধারিতে বালি ছিনিয়ে তরুণ–তরুণীদের দল বেধে নাচ। সেসব দৃশ্য ভোলা যায় না!

সে বছর তরু সঙ্গে ছিল। তরুর কথা মনে হতেই ভাবনাটা মোড় নেয়। সেদিন ফোন করে তরু কি যেন বলছিল, এই সময়টা বুসানের নীল জলে লক্ষ লোকের মেলা বসে। হাজারও জাহাজ ভেড়ে। সেই জাহাজে চড়ে নাকি জাপানে পাড়ি জমানো যায়। অন্তত তরুর জানাশোনা কয়েকজন নাকি ওভাবেই জাপান চলে গেছে। দালালকে কিছু দিলে ওরাই সব ঠিকঠাক করে দেয়। পোর্ট কন্ট্রাক্ট সিসটেম।

দমকা বাতাসে বৃষ্টির ছাট এসে লাগে বাদলের কপালে। একটু নড়েচড়ে বসে দ্বিতীয় সিগারেটটা জ্বালায় সে। গ্রামের কথা মনে পড়ে যায় হঠাৎ। এখন বাংলা কি মাস আষাঢ়? শ্রাবণ? এই সময়ে মূল ঘর–এর বাদলদের বাড়ির উঠোনে পুইশাক আর লাউ ডগাগুলো লক লক করে উঠতো। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ ছন্দ তুলে বাজতো।

ঢোলমারির বিলে ছোট্ট ডিঙি নৌকা নিয়ে শোল মাছ ধরতে যেতো বাদল।

আট ভাইবোনের সংসারে অভাব ছিল, অসুখে ছিল না। নিজেদের জমির ফসল। আবার ছোট্ট চাকরির জোরে চলে যেতো ভালো–মন্দে। কিন্তু এক সময় বাবা বুড়ো হলেন। মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বড় বোনটার শ্বশুরবাড়িতে কি যেন ঝামেলা হলো। বড় ভাইয়ের ছোট্ট কারবারটা শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়লো। মেজ বোনের বাচ্চাটা কঠিন অসুখে পড়লো। ছোট বোনটার বিয়ের বয়স হলো।

আট ভাইবোনের সবার ছোট বাদল। পড়াশোনার পাট চুকিয়ে সহপাঠিনীর চুড়ির রিনঝিন শব্দ ভুলে কিছু জমি বেচে কিছু দেনা করে এই প্রবাসে আসতে হলো। চার বছরে অবশ্য শোধ হয়েছে সব। বড় বোনটা ফিরে গেছেন শ্বশুর বাড়িতে। ভাইয়ের কারবার চাঙ্গা হয়েছে। মেজ বোনের মেয়েটাকে মাদ্রাজে চিকিৎসা করানো হয়েছে। ছোট বোনটার বিয়ে হয়েছে।

বাদলের পথ চেয়ে বসে আছে সোনালি। কিন্তু যন্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত বাদল। নিজের বলে সামান্য সঞ্চয় আজও হয়ে ওঠেনি। দেশে ফেরার জন্য মনটা হুটহাট করে কেদে ওঠে। এখনো অনেক টাকা চাই তার। নিজের জন্য। এতোদিনের সব আয় চলে গেছে আজন্ম স্নেহ ঋণ শোধে। এখন নিজের কিছু সঞ্চয় চাই। এখানে পরিশ্রম বেশি, আয় কম।

লোকে বলে, জাপানে গেলে মাসে লাখ টাকার বেশি জমানো যাবে। সিদ্ধান্ত নেয় বাদল, আগামীকাল ডিউটি সেরেই তরুকে ফোন করতে হবে। ঝম ঝম বৃষ্টির ঘোর শব্দে একটু যেন শীত লাগে তার। সিগারেটের শেষাংশ বৃষ্টির জলে ছুড়ে ফেলে ঘুমাতে যায়।

রাতের আধো জ্যোৎস্নায় মাছ ধরা মাঝারি জাহাজটা অদ্ভুত দানবের মতো মনে হয় বাদলের। রাতের সৈকতপ্রেমীদের পেছনে ফেলে ছোট ট্রলারটা নিয়ে সাগরে ভেসেছে কিছুক্ষণ আগেই। সাগরের গর্জন এবং পাহাড়ি ঝাউ গাছে আছড়ে পড়া বাতাসে তবু ওপেন কনসার্ট–এর ড্রামের দ্রুম দ্রুম আওয়াজ ভেসে আসে কানে। ডান দিকের আকাশে আতশবাজির ঝলকানি। পট পট শব্দে ম্লান হয়ে যায় কোস্ট গার্ডের পেট্রোল বোটগুলোর ইতিউতি।

পাকিস্তান, চায়নিজ এবং বাঙালি মিলে তাদের নয়জনের দলের ট্রলারটা এক সময় মাঝারি জাহাজটার গায়ে থামে।

একজন মোটা মতো নাক ভোতা লোক তাদের উঠতে সাহায্য করে।

জাহাজে ওঠে আরেকবার দূরের উচ্ছল সৈকতের দিকে তাকায় বাদল।

সবার শেষে উঠে তরু।

ডেক পার হয়ে একদম পেছনের দিকের কন্টেইনারগুলোর দিকে হেটে যায় তারা। সারি সারি করে রাখা মাছের কন্টেইনারগুলোর একটার সামনে জড়ো হয় তারা।

মোটা লোকটা সবার মোবাইল চেয়ে নিয়ে ব্যাটারিগুলো খুলে রাখে।

একটা লোক কিছু খাবার আর পানির বোতল এনে হাতে দেয় সবার।

সবার জন্য একটা মাত্র টর্চ। রাতের শীতল বাতাসে হঠাৎ শরীরটা কেপে ওঠে বাদলের। তরুর হাতে মৃদু একটা চাপ দিয়ে আশ্বস্ত করে, নাকি নিজেই আশ্বস্ত হতে চায়। ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ–এ কেপে কেপে উঠে নোঙ্গর ফেলে থাকা জাহাজটা।

জানিয়ে দেয়া হয় ন্যূতম বিশ ঘণ্টার পথ পাড়ি দিতে হবে তাদের। এর মধ্যে কোনো যোগাযোগ চলবে না। বেশি খাবার দিলে বাথরুমের সমস্যা হতে পারে। তাই স্বল্প বরাদ্দ। সব ঠিকঠাক মতো চললে আগামীকালের শেষ রাতে তারা *ইলবন* বা জাপানের জলসীমায় পৌছাবে। তারপর আবার ট্রলারে করে ঢুকতে হবে জাপান। এরপর একটা কন্টেইনারের ভেতর তাদের নামিয়ে মুখটা লক করে দিয়ে চলে যায় লোকগুলো।

কন্টেইনারের মুখটা বন্ধ হতেই আকাশটা হারিয়ে যায় চোখের সামনে থেকে। হঠাৎ গুমোট অন্ধকারে নিস্তব্ধতা প্রকট হয়ে ওঠে। মাছের বিচ্ছিরি গন্ধে নাড়ি–ভুড়ি উল্টে আসে যেন। এক সময় চলতে শুরু করে জাহাজটা। টের পায় তারা। টর্চটা জ্বেলে থিতু হয় সবাই।

ক্রমাগত ইঞ্জিনের যান্ত্রিক গোঙানি এবং উটকো গন্ধ উপেক্ষা করে নির্ঘুম অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে বাদল। চোখের সামনে একে একে ভেসে ওঠে মা, ছোট আপা, সোনালি এবং সব প্রিয় মুখ। জানে না বাদল কি আছে এই যাত্রার শেষে। শুনেছে সে কোস্ট গার্ডের প্রহরা এড়াতে না পারলে সম্ভব হবে না স্বপ্নের জাপানে ঢোকা। ফিরে যেতেও একই সমস্যা। সেক্ষেত্রে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়তে হবে। দিনের পর দিন সমুদ্রে মাছ শিকার করবে এই জাহাজ। ততোদিন তাদের কন্টেইনারেই মরতে হবে। তারপর সুযোগ বুঝে একদিন গভীর সমুদ্রে ফেলে দেয়া হবে তাদের লাশগুলো। পরিশোধিত টাকার দাবি যেন তারা আর করতে না পারে।

জাপানের জলসীমা কতো দূরে জানে না তারা কেউ–ই। বিশ ঘণ্টা, নাকি একটা জীবন! অন্ধকার কন্টেইনারের গহ্বরে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে দুলতে থাকে স্বপ্ন ভরা জ্বলজ্বলে নয় জোড়া চোখ।

সাউথ কোরিয়া থেকে
jinjira13@yahoo.com

ভয়

– কাজী মোহাম্মদ নূহ হাবীবুল্লাহ

এক.

মে মাস ১৯৯৬ সালের কোনো একদিন। আমি তখন সদ্য বেকার। কন্স্ট্রাকশন ফার্মে চাকরি করতাম। নতুন বিয়ে করেছি। চাকরি একটা করতেই হবে। যমুনা সেতুর কাজও শুরু হয়েছে। *সামহোয়ান কন্স্ট্রাকশন কম্পানি* সেতুর দুই পাড়ে এপ্রোচ রোড তৈরি করছে। একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান পদে জীবন বৃত্তান্ত জমা দিলাম মেটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ার মি. চো–এর কাছে।

তিনি বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদের পর আশ্বাস দিলেন এবং পরের দিন আসতে বললেন।

আমার বাড়ি সিরাজগঞ্জ শহরে। ভাবলাম টাঙ্গাইল থাকতে হলে হোটেলে থাকতে হবে। আর হোটেলে থাকতে হলে অনেক খরচ–এর চেয়ে বাড়ি ফেরাই ভালো। ভুয়াপুর লঞ্চ ঘাটে এসে লঞ্চে উঠে বসলাম। লঞ্চ তখন মাঝ নদীতে। হঠাৎ ঝড় উঠে এলো। যাত্রীরা চিৎকার করছে পাশের কোনো চরে লঞ্চ ভেড়ানোর জন্য। কিন্তু লঞ্চ ড্রাইভারের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। যাত্রীরা সকলেই অসহায়। মহান করুণাময়ের করুণায় ঝড় শেষ হলো।

লঞ্চ ড্রাইভার সগর্বে বলতে শুরু করলো, এ রকম ঝড় কতো দেখেছি...।

আমার মনে হয় প্রত্যেক লঞ্চ ড্রাইভারই এমন ভাবে ডেকে আনে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু। এখন যমুনা সেতু হয়েছে। যখনই যমুনা সেতু পার হই তখনই মনে হয়, বাংলাদেশের সবগুলো নদীর ওপর যদি সেতু থাকতো তাহলে নিরীহ মানুষগুলো লঞ্চ ড্রাইভারদের হাত থেকে মুক্তি পেতো।

দুই.

এপৃল মাসের কোনো একদিন। ১৯৯৯ সাল। আমি একজন গর্বিত পিতা। স্ত্রী–সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি শ্বশুরবাড়ি। কক্সবাজারের মহেশখালী থানার গোরকঘাটার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। চট্টগ্রাম পার হওয়ার পর থেকে বৃষ্টি। কক্সবাজার পৌছালাম। শুনলাম বিপদ সংকেত বার্তা। সাত নাম্বার বিপদ সংকেত। সিদ্ধান্ত নিলাম কোনো হোটেলে উঠবো। বিপদ সংকেত পার হওয়ার পর মহেশখালীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। কিন্তু বিপদ আরো বেশি। এখানে গরুর দুধ পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও কোথায় এটা গরম করবো, ছেলেকে খাওয়াবো!

প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমার ছেলে জন্মের পর মায়ের বুকের দুধ পান করেনি। ডাক্তার চেষ্টা করার পরও যখন পারেনি তখনই শিশুটিকে বাচানোর জন্য গরুর দুধ পান করাতে পরামর্শ দেন।

যাহোক, ছেলেকে দুধ দিতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। ফলে সাগরের চ্যানেল পাড়ি দিতেই হবে।

কস্তুরাঘাটে গিয়ে দেখি কোনো বড় নৌকা নেই। একটি স্পিডবোট মহেশখালী যাবে। উঠে পড়লাম স্পিডবোটে। সাগরে পড়ামাত্রই বুঝতে পারলাম সাগরের অস্বাভাবিক ঢেউ। মনে হলো এখানেই বুঝি আমাদের সলিল সমাধি রচনা হবে। চোখ বন্ধ করে ডাকতে শুরু করলাম সৃষ্টিকর্তাকে। অবশেষে যখন মহেশখালীর জেটিতে পৌছালাম তখন মনে হলো প্রাণগুলো এবারের মতো বেচে গেল।

তিন.

১০ এপৃল ২০০২ সাল। চাকরি করি একটি বেসরকারি কম্পানিতে। চাকরির সুবাদে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানার *হোটেল আল রশিদ*–এ অবস্থান। স্ত্রী–পুত্রের সঙ্গে দীর্ঘ দিন সাক্ষাৎ নেই ছুটি হয়নি বলে।

স্ত্রী জানালো, যেহেতু আমার সময় হচ্ছে না, তাই সে সিলেট আসবে। আমি তাকে সিলেট থেকে নিয়ে আসবো। আসতে বলার পরই সে জানালো, ৯ তারিখ রওনা হচ্ছে।

১০ তারিখ সকালে সিলেট থেকে নিয়ে ছাতকের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং হোটেলে উঠলাম।

জানালা দিয়ে তাকাতেই আমার ছেলে লাফিয়ে উঠলো। বাবা কতো জাহাজ, আমাকে জাহাজে চড়াও।

ছেলের পীড়াপীড়িতে আমাকে রাজি হতে হলো।

বিকেলে সাবকন্ট্রাক্টটারের লোক এসে জানালো, কার্গো লোড শেষ হয়েছে। এখন মাপতে হবে পাথরের পরিমাণ জানার জন্য।

ছেলেকে নিয়ে রওনা হলাম। খেয়া নৌকায় সুরমা নদী পার হতে হবে। আমরা উঠে বসলাম একটি ডিঙি নৌকায়। আমরা যে নদীটি পার হবো সেটা সুরমার শাখা।

এই শাখা এসেছে সিলেট থেকে। এটি মূল সুরমা।

আরেকটি শাখা এসেছে কম্পানিগঞ্জ থেকে।

নদী পার হচ্ছি। কম্পানিগঞ্জ থেকে আসা সুরমা নদীর মুখে আসতেই দেখি পাহাড়ি ঢল নেমেছে। পাহাড়ি ঢল সম্বন্ধে আগে কোনো ধারণা ছিল না। নৌকা যে অবস্থানে আছে সেখান থেকে পেছনে ফেরার উপায় নেই। ফলে অসহায়।

মাঝি প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো নদী পার হতে। কিন্তু পানির প্রবল বেগের কাছে মাঝির বৈঠা কোনো কাজ করছে না। মাঝনদীতে মাঝি অসহায় ভঙ্গিতে হাল ছেড়ে দিল। নৌকাটা এক মুহূর্তের মধ্যে এসে ধাক্কা লাগলো নোঙ্গর করা পাথর বোঝাই একটি বড় নৌকার সঙ্গে।

নৌকাটা ভেঙে তলিয়ে যাচ্ছে। আমার কোলে আমার ছেলে। অপর হাত দিয়ে পাথর বোঝাই নৌকাটা ধরলাম। প্রবল স্রোতে আমাকে টেনে নিতে চাচ্ছে। জীবন বাচানোর সংগ্রাম। কিন্তু অসহায়। আমার অল্প দূরেই আরেকজন ভদ্রলোক ঝুলছেন। তার সহায়তায় আমার ছেলেকে নৌকার ওপর তুলে দিলাম।

ভদ্রলোকও নৌকার ওপরই উঠে পড়লেন।

আমি চিৎকার শুনছি। বেশ কয়েকজন নদীতে ভেসে গেছেন। তাদের দিকে লক্ষ্য করেই এ চিৎকার। এদিকে আমিও চিৎকার করছি আমাকে নৌকায় ওঠানোর জন্য। একজন আমার চিৎকার শুনে এগিয়ে এলেন। পরে আরো কয়েকজন ধরাধরি করে ওপরে তুললেন এবং নৌকা থেকে নোঙ্গর করা জাহাজে উঠতে সহযোগিতা করলেন।

সবশেষে জাহাজ থেকে নদীর কূলে নেমে ছেলেকে বুকে আকড়ে ধরে শুয়ে থাকলাম মাটির ওপরেই।

নদী এক সময় শান্ত হলো। বড় একটা ইঞ্জিন নৌকায় পার হয়ে ছাতক এলাম। হোটেলে পৌছে ছেলেকে তার মায়ের কোলে তুলে দিয়ে বললাম, আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং মহান সৃষ্টিকর্তা।

এরপর থেকে নদী দেখলে ভয় হয়।

সিরাজগঞ্জ থেকে

মাঝির ছেলে

– আরিফা আক্তার

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সাল। আমি ও আমার ছোট ভাই আসিফ তিস্তা চরে হাটছি। কখনো চরে, কখনো অল্প পানিতে আর পাগল করা চরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসহ ফাল্গুনি হাওয়া উপভোগ করছি। বাবা অদূরে দোকানে বসে আছেন। ছোট দুই একটি নৌকা উদ্দেশ্যহীন ভাবে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা অপেক্ষা করছি ইঞ্জিনচালিত বড় নৌকার জন্য। কখন আসবে, আমরা চড়বো।

জীবনে কখনো নৌকায় চড়িনি। একদিকে জীবনে প্রথম নৌকায় চড়া, অন্যদিকে পাগল করা সৌন্দর্য আমাদের অস্থির করে তুলছিল। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত নৌকা ঘাটে এসে পৌছলো। আমরা ও আরো অনেকে নৌকায় চড়লাম। আমরা ছাড়া সবাই গ্রামের অশিক্ষিত সহজ–সরল নারী–পুরুষ ও শিশু।

আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টি ও প্রশ্নের জবাব তারা বেশ খুশি মনে দিচ্ছিলেন। আমাদের আনন্দ নৌকার বাকি সবার মাঝে বিস্তার লাভ করলো।

কিছুক্ষণ পরেই মাঝি ও তার ছেলে নৌকা ছাড়লো। বৃদ্ধ মাঝি ইঞ্জিন চালনায় ও ছেলে নৌকার মুখ ঠিক রাখার জন্য হাল ধরলো।

চারদিকে লক্ষ্য করছিলাম ও বেশ মজা পাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার চোখ দুটো স্থির হলো, হাল ধরা অবস্থায় মাঝির ছেলের ওপর, তেরো চোদ্দ বছরের হাড় জিরজিরে, শুকনো, কালো, পাচ ফিট পাচ ইঞ্চি ছেলেটির ওপর, যার চোখ দুটো ছিল রাজ্যের মায়ায় ভরা। নৌকার দিক ঠিক রাখতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। সদ্য জেগে ওঠা চরের ওপর দিয়ে বা তা এড়িয়ে নৌকা চালাতে যে কসরত তাকে করতে হচ্ছিল সেটা আর লিখতে পারছি না। তারপরও তার মুখে লেগে ছিল হাসি। কষ্ট সহ্য করে হাসি মুখে সে তার কাজ করে যাচ্ছিল।

সামান্য দুই মুঠো ভাতের জন্য সে কষ্ট সহ্য করে হাসি মুখে বাবার সঙ্গে রোজগার করছে। শুধু নৌকার হাল নয়, সংসারের হালও সে ধরেছে কঠোর হাতে। অথচ আমরা শহরবাসীরা কখনো কল্পনা করতে পারি না এ অসহায় শিশুদের কথা! তাদের জীবন যুদ্ধের কথা আমাদের পুরোপুরি অজানা।

সেদিন আমার মনের মাঝে আমার অজান্তেই স্থান করে নিল মাঝির ছেলে যা আজো মুছে ফেলতে পারি না।

ধাপভগিলেন, রংপুর থেকে

রিচার্ড ও ভালোবাসার নদী

- নাজমুন নাহার মুক্তা

একটি নদীই করেছে সব অসম্ভবকে সম্ভব। এই নদী আর ছোট একটা নৌকা ছিল বলেই একজন আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর কথাটা বলেছিল। সব বাধাকে অতিক্রম করে যোজন যোজন মাইল দূর থেকে চলে এসেছে আমার কাছে।

রিচার্ডের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সাত বছর আগে এক বৃষ্টির দিনে, শেরাটনের লবিতে। রিচার্ড আমেরিকান ছেলে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে সবে ডাক্তারি পাস করা এক টগবগে সুদর্শন যুবক। এ দেশে এসেছে প্রতিবন্ধীদের ওপর কাজ করতে। থাকবে দুই মাস। এ দুই মাস রিচার্ড–এর দোভাষী হিসেবে আমি কাজ করবো। দোভাষী হিসেবে প্রথম কাজ করতে যাচ্ছি। তাই কিছুটা ভয় এবং কিছুটা উত্তেজনা কাজ করছিল।

রেজাভাই এবং রিচার্ড এক সঙ্গে পড়াশোনা করেছেন। রিচার্ডের সঙ্গে রেজাভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন এভাবে, এ হলো মুক্তা, তোমার দোভাষী।

রিচার্ড অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলো, মুখতা।

হেসে বলি, আমার নামের ইংরেজি মিনিং পার্ল (Pearl)।

Really? Very nice name. I'm Richard. রিয়ালি? ভেরি নাইস নেইম। আই অ্যাম রিচার্ড। বলেই আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেক করার জন্য।

হঠাৎ কি হলো জানি না, আমি তার চোখে চোখ রেখে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, এটা আমার কালচার নয়। আমি আমার কালচার মেনে চলি। তুমিও তা করো এবং এই কালচারকে সম্মান করো।

রেজাভাই চমকে আমার দিকে তাকান। সে আমাকে দোভাষী হিসেবে পছন্দ করবে না জানতাম। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে রিচার্ড বললো, সরি, তোমার কালচার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। তুমি এ সম্পর্কে আমাকে কিছুটা ধারণা দেবে?

নিশ্চয়ই। আমরা কবে থেকে কাজ শুরু করবো?

আগামীকাল থেকে। তবে প্রথম পাচ দিন তুমি আমাকে তোমার দেশ সম্পর্কে, কালচার সম্পর্কে জানাবে এবং ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখাবে।

সকাল আটটার মধ্যে আমি আসবো। তুমি রেডি থেকো। ওকে।

রাস্তায় নেমে রেজাভাই এতোক্ষণ ধরে চেপে রাখা রাগ আমার ওপর ঝাড়তে শুরু করলেন।

জানিস, অন্য কেউ হলে তোকে দোভাষী হিসেবে পছন্দ করতো না। রিচার্ড অতিমাত্রায় ভদ্র ছেলে বলেই কিছু মনে করেনি। আর ও জানে তুই আমার বোন।

পছন্দ না করলে না, থোড়াই কেয়ার করি আমি ওদের পছন্দকে। আমি চাই রিচার্ড এ দেশের সব সত্যটুকু জানুক। অতিরিক্ত স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে কিছুতেই এ দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে ছোট করতে পারবো না। ও জানবে এ দেশের মানুষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পারিবারিক বন্ধন, আন্তরিকতা, সততা, সরলতা, বিশ্বাস, ভালোবাসা ইত্যাদি। তারপর এক সময় হৃদয়ের গভীর থেকে বলবে, এ দেশে না এলে বুঝতেই পারতাম না জীবনটা খুব সুন্দর। তারচেয়েও বেশি সুন্দর এই ছোট সবুজ দেশের মানুষরা।

একদমে কথাগুলো বলে হাপাতে লাগলাম।

রেজাভাই আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, বুড়ি, আমি তো জানি, তুই খুব স্পষ্টভাষী, সত্য কথা বলতে কাউকে পরোয়া করিস না। আর তোর এই দিকগুলোই আমার খুব পছন্দ। উইশ ইউ গুড লাক।

পরদিন থেকে শুরু হলো আমার জীবনের প্রথম চাকরি। প্রথমেই নিয়ে গেলাম লালবাগ কেল্লায়। তারপর একে একে আহসান মঞ্জিল, সোনারগাও, ময়নামতি, স্মৃতিসৌধ, সংসদ ভবন, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, জাতীয় জাদুঘর এবং আরো অনেক জায়গায়। শুধু বাদ রাখলাম বুড়িগঙ্গা। এটা আমার বিশেষ পছন্দের জায়গা। তাই ঠিক করলাম যাওয়ার আগে দেখাবো যেন মুগ্ধতা নিয়ে দেশে ফিরতে পারে।

যখন প্রতিবন্ধীদের কথা অনুবাদ করে বলতাম কিংবা কোনো ঐতিহাসিক জায়গার বর্ণনা দিতাম তখন ও মনোযোগ দিয়ে শুনতো যেন খুব মনোযোগী ছাত্র। একদিন তো বলেই বসলো, টিচার হলে খুব ভালো করবে। অন্যকে নিজের আয়ত্তে আনার প্রচণ্ড এক ক্ষমতা আছে তোমার মধ্যে।

হেসে বলি, ধন্যবাদ।

রিচার্ডকে একদিন নিয়ে গেলাম আমার গ্রামের বাড়িতে। লাল শাড়ি পরে সবুজ ধানক্ষেত দেখাতে নিয়ে গেলাম ওকে।

ও মুগ্ধ চোখে দেখছে হালকা বাতাসে ধান গাছের দোল খাওয়া। তারপর এক সময় আমার দিকে তাকায় কয়েক পলকের জন্য।

আমি ওর চোখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করি, পারি না। চোখের ভাষা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। আমি কবি নই। অতি সাধারণ একজন। নীরবতা ভেঙে রলি, রিচার্ড এসো, তোমার কিছু ছবি তুলি। কয়েকদিন পর তো চলেই যাবে। আর কখনো দেখা হবে কি না জানি না। হয়তো কিছু দিনের মধ্যে আমাকে ভুলে যাবে। কিন্তু যদি কখনো ছবিগুলোর দিকে হঠাৎ করেই তোমার চোখ পড়ে তবে হয়তো আমার কথা তোমার মনে পড়বে।

আমি বার বার ফিরে আসবো এ দেশে। এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কাছে এবং...। ও শেষ করে না।

আমিও কোনো প্রশ্ন করি না।

আর তিন দিন পর রিচার্ড চলে যাবে। আমার ভেতর এক ধরনের শূন্যতা বিরাজ করে। প্রচণ্ড কষ্ট হয়। চিৎকার করে কাদতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে বলি, যেও না, এখানে থেকে যাও। কিন্তু বলা হয় না।

রেডি থেকো। আগামীকাল তোমাকে নিয়ে বুড়িগঙ্গায় যাবো। নৌকায় ঘুরবো দুই তিন ঘণ্টা। এ নদী পৃথিবীর আর দশটা নদীর মতো না। এ নদী ভালোবাসার নদী, হারিয়ে যাওয়ার নদী, এ নদী দুঃখ ভোলার নদী। এ নদী...। আমি শেষ করতে পারি না। আমার গলা আটকে আসে। প্রচণ্ড পিপাসা লাগে। মনে হয় এক সমুদ্র পানি খেলেও এ পিপাসা যাবে না। কোনো রকমে বলি, বোঝানো যাবে না, এ শুধু অনুভবের বিষয়।

ভোর রাত পাচটায় রিচার্ড ফোন করলো।

আমি কি খুব বেশি রাতে ফোন করেছি?

না, তুমি খুব ভোরে ফোন করেছো।

আমরা কখন নৌ ভ্রমণে যাচ্ছি?

এখন থেকে ঠিক চার ঘণ্টা পর, আমি তোমার হোটেলে আসবো, রেডি থেকো।

আমি কি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

চার ঘণ্টা পর বললে হয় না?

হয়। কিন্তু...।

ঠিক আছে, বলো।

আমি সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। নিজেকে বোঝাতে চেয়েছি। কিন্তু পারিনি। আমার মনে হয় আমি...।

হ্যা বলো, তুমি কি?

না থাক। তোমার প্রিয় নদীতে যখন ঘুরবো তখন বলবো।

ঠিক আছে।

ফোন রেখে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু হলো না। নিজেকে খুব একাকী, খুব অসহায় মনে হলো। ধর্মের দেয়াল, ভৌগোলিক সীমারেখা সব কিছুকে তুচ্ছ করে আমিও যে রিচার্ডকে ভালোবেসেছি! জানি, এ কখনো সম্ভব নয়। আমি পারবো না দেশান্তরী হতে, বাবা মাকে কষ্ট দিতে, তাদের ছেড়ে থাকতে।

সর্বোপরি অন্য ধর্মের একজনকে নিয়ে ঘর বাধা অসম্ভব। কারণ ধর্মের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস। নিজের অজান্তেই দুই ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিলাম, রিচার্ডের মুখোমুখি হবো। সব সীমাবদ্ধতার কথা তাকে বুঝিয়ে বলবো। হয়তো কষ্ট পাবে সাময়িকভাবে। কিন্তু এক সময় আমেরিকার ব্যস্তময় জীবনে ভুলেও যাবে সব কিছু।

আমরা দুজন বুড়িগঙ্গার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। কেউ কোনো কথা বলছি না। আড়চোখে শুধু একবার তাকে দেখে নিলাম।চোখ লাল টকটকে যেন এখনই রক্ত ঝরবে।

তিন ঘণ্টার জন্য নৌকা ভাড়া করলাম। দুজন মুখোমুখি বসে আছি। সংক্ষেপে নদী সম্পর্কে দুই একটা কথা বললাম।

তোমার নদীটা খুব সুন্দর। এতোদিন তুমি বলেছো, আমি শুনেছি। আজ আমি বলবো, তুমি শুনবে। প্রথম দিন থেকেই তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। আমি চেষ্টা করেছি ভালো লাগা প্রকাশ না করতে। দিনের পর দিন তোমার সঙ্গে চলতে চলতে ভালো লাগাটা ভালোবাসায় রূপ নিল। এবং তা এতো গাঢ় হলো...। নিজেকে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু তুমি যখন বললে নদীটা একদম অন্য রকম, ভালোবাসার নদী, হারিয়ে যাওয়ার নদী, দুঃখ ভোলার নদী। তখন মনে হলো এখানেই তোমাকে জানানো উচিত আমার ভালোবাসার কথা ভালোবাসার নদীতে। যদি তুমি ফিরিয়ে দাও তবে তা বিলিয়ে দেবো এই নদীতে এবং দুঃখ ভোলার নদীর

দিকে তাকিয়ে সব দুঃখ ভুলে যাবো। আবার পর মুহূর্তেই তাকাবো এই ভালোবাসার নদীর দিকে তোমাকে নতুন করে ভালোবাসতে।

ছল ছল চোখে রিচার্ডের দিকে তাকাই। যা বলবো ভেবে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলাম সেগুলো কেমন যেন গুবলেট পেকে গেল। আমরা দুজন অবোধ শিশুর মতো ডুকরে কেদে উঠি। নদীর পানির সঙ্গে আমাদের চোখের পানি একাকার হয়ে যায়।

এতোক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলেছি। তাই মাঝি কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু আমাদের কান্নার শব্দে সে শুধু একবার পেছন ফিরে দেখে তারপর আবার নৌকা বাইতে শুরু করে এক মনে।

আমাদের কান্না থামে না যেন কেদেই সব সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করবো, যেন কেদেই আজ সব অসম্ভবকে সম্ভব করবো। এতোটাই আমরা কাদি।

নৌকা যখন মাঝ নদী থেকে তীরে ফিরে আসছে তখন রিচার্ড বলে, আমি জানি, তুমি চমৎকার গান করো। এখন কি তুমি আমার জন্য কয়েক লাইন গাইবে?

আমি পৃথিবীর সমস্ত আবেগ গলায় এনে পড়ন্ত বিকেলে গেয়ে উঠি, *তুমি আমার প্রথম সকাল, একাকী বিকেল, ক্লান্ত দুপুর বেলা। তুমি আমার সারা দিনমান। তুমি আমার সারা বেলা।* তারপর তাকে গানটা অনুবাদ করে শোনাই।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক পলক। তারপর খুব অসহায়ভাবে বলে, আমি কি তোমার হাতটা একটুখানি ধরতে পারি?

চোখ বন্ধ করে তার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিই। তারপর কি মনে করে আবার গুটিয়ে নিই।

ও কিছু বলে না শুধু তাকিয়ে থাকে।

দুই দিন পর রিচার্ড আমেরিকায় চলে যায়।

গত পাচ বছর যাবৎ রিচার্ড বাংলাদেশে আছে। দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি সব কিছুকে পেছনে ফেলে ও চলে এসেছে আমার কাছে। একেবারে চলে এসেছে। ও এখনো আমার জন্য পাগল পারা। এখনো আমরা বুড়িগঙ্গায় যাই নৌকা ভ্রমণে। তবে এখন সঙ্গে থাকে আমাদের তিন বছরের মেয়ে সুপ্রভা।

najmun@mail.com

কিশোর বেলায়

- সালাহ্ উদ্দিন

আমাদের গ্রামটি বলতে গেলে চতুর্পাশেই নদী বেষ্টিত চর এলাকায়। এ কারণে আঞ্চলিক ভাষায় আমাদেরকে *খাস চইরা* বলে টিপ্পটি কাটতো অন্য এলাকার লোকেরা। একবার বর্ষাকালে বাড়ির চারদিকেই থই থই করে পানি। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যেতে নৌকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। গ্রামের দিকে তাকালে প্রতিটা বাড়িকেই এক একটা ছোট দ্বীপ ছাড়া অন্য কিছু ভাবার অবকাশ নেই।

আষাঢ় মাস। একে তো বাড়ির কূল ঘেষে টইটম্বুর পানি, তার উপর সারা দিনব্যাপী অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে কয়েকদিন যাবৎ। হঠাৎ করে বৃষ্টিটা ঝরে যাওয়ায় লোকজন ঘর থেকে বের হয়েছে মাত্র। আমার দাদি গোয়ালঘরের দিকে একবার ঘুরে এসে গরুগুলোর দুর্দশা দেখে হা-পিত্যেশ করছেন। সারা দিন যাবৎ গরুগুলো কিছুই খায়নি বলতে গেলে। অল্প কিছু খড় ছিল। এ কয়েকদিনে তাও সাবাড়। গরুগুলো এক নাগাড়ে ক্ষিধের জ্বালায় হাম্বা হাম্বা রবে ডেকে যাচ্ছে। গরুর দেখাশোনা সেজকাকাই করে থাকেন। তিনি আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে যাওয়ায় গরুর খাবারে ভীষণ সংকট দেখা দিয়েছে। তিনি বাড়ি থাকলে যতো দূর থেকেই হোক ঘাস জোগাড় করে এনে গরুকে খাওয়াতেন। যদিও এগারো বারো বছর বয়সের এক রাখাল ছেলে আছে, তাকে দিয়ে শুধু ঘাস-খড় গরুর সামনে বাড়িয়ে দেয়া যায়।

আমি তখন ক্লাস ফাইভের ছাত্র। আমাদের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলটির খুবই সুনাম এলাকায়। প্রধান শিক্ষক দীনেশবাবুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রায় প্রতি বছরই দুই তিনজন বৃত্তি পেতো সেই স্কুল থেকে। বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্য আমাকে দাদার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল থানা সদরে অবস্থানরত পরিবারের সবাইকে রেখে।

দাদি নিরুপায় হয়ে আমার কাছে এসে বললেন, দাদা, হযরতকে নিয়ে ভাটির চর থেকে যদি কিছুটা ঘাস কেটে আনতে পারতিস, তবে কি না গরুগুলোকে বাচানো যেতো। তোর ঘাস কাটতে হবে না, তুই শুধু নৌকায় বসে থাকবি, হযরত যতোটুকু পারে ততোটুকুতেই আপাতত চলে যাবে। তারপর তোর কাকা এলে কোনো সমস্যা হবে না।

হযরত কাজের ছেলে। দাদির প্রস্তাব শুনে মনে মনে আমি তো আহ্লাদে আটখানা। দুজনে মিলে মনের আনন্দে নৌকা বাইতে পারবো। আমাদেরকে আর পায় কে!

হযরতকে নিয়ে বিছানার চাদর দিয়ে পাল খাটিয়ে মাইল তিনেক দূরের চরে রওনা হলাম। আমি পালের রশি ধরে। আর হযরত আস্তে আস্তে বাইতে থাকলো। স্রোতের ভাটিতে হওয়ায় কিছুটা দ্রুতই গন্তব্যে পৌছাতে পারলাম। গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড। বিভিন্ন এলাকা থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় অর্ধশতাধিক লোক সবাই ঘাসের খোজে এখানে এসেছে। দ্রুত গতিতে যে যতো পারছে ঘাস কেটে নৌকায় ভরছে।

আমরাও কালবিলম্ব না করে দুজনেই নেমে পড়লাম নৌকাটাকে খুটিতে বেধে। অনেক বড় বড় সাইজের ঘাস। প্রায় ঘণ্টা খানেক কাটার পর দেখতে পেলাম নৌকার এক-তৃতীয়াংশ ভরে গেছে।

কোথা থেকে কি হলো হঠাৎ করে লোকজন যেন ছোটাছুটি শুরু করে দিল। কাটা ঘাসগুলো তাড়াহুড়া করে নৌকায় তুলে নৌকা ছাড়তে পারলে বাচি। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুই বোধগম্য হলো না। হঠাৎ করে উত্তর দিকে চোখ পড়ায় দেখতে পেলাম উত্তর আকাশ পুরোটাই অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। সাই সাই করে বাতাসও বইতে শুরু করেছে। এতোক্ষণে আমরা বুঝতে পারলাম অন্য সকলে হই-হুল্লোড় করে নৌকা ছাড়তে পাগলপারা হয়েছে কেন।

আমরাও কালবিলম্ব না করে নৌকা ছেড়ে দিলাম। এবার আমি ধরলাম হাল আর তাকে বললাম শক্ত করে পালের রশিটা চেপে ধরতে। নৌকা ছোটালাম নদীর মাঝ বরাবর। নদীর তীর ঘেষে নৌকা চালালে বিপদের মুহূর্তে হয়তো কিছুটা সাতরে তীরে উঠে পৈত্রিক জানটা বাচানো যাবে। সহজ কথাটা বোঝার মতো বয়স হয়নি তখনো।

দমকা বাতাস আর বৃষ্টি মুহূর্তেই প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো। কচি হাত দুটো দিয়ে প্রাণপণে আকড়ে ধরে আছি বৈঠাটাকে এবং পালের রশিটাকে। সামান্য এদিক-ওদিক হলেই নির্ঘাত সলিল সমাধি দুজনেরই। প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটা পালে লেগে নৌকার পেছনের দিকটা অন্তত এক ফিট উচু হয়ে যায় মাঝে মধ্যে। পেছনের দিকটায় ঘাস রাখাতে ভারী হওয়ায় উল্টে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি হয়তো। শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে বৈঠাটাকে বগলের নিচ দিয়ে বুকে আকড়ে ধরে আছি। পালও বাতাসের তোড়ে ছিড়ে যায় অবস্থা।

হযরত ভয়ে পাংশুটে হয়ে যাওয়া মুখটাকে নিয়ে একবার আমার দিকে আবার পালের দিকে তাকায়।

আমার কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু বৈঠাটাকে সঠিকভাবে ধরে রাখাই একমাত্র ব্রত আমার। জীবন-মৃত্যুর সূক্ষ্ম সুতার ওপর দিয়ে যাচ্ছে যেন মুহূর্তগুলো।

এক পর্যায়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি। ঝড়ও থেমে গেছে অনেকটা। দাদিকে দেখলাম উদভ্রান্তের মতো দৌড়াতে প্রায় হাটু পানিতে নেমে এসেছেন। আমাদেরকে কাছে পেয়ে নিজের জীবনটাই যেন ফিরে পেলেন আবার।

আজ প্রায় ছাব্বিশ বছর গত হয়েছে। দাদিও বেচে নেই এখন। কিন্তু কিশোরবেলার সেই দুঃসাহসিক নৌকা ভ্রমণের কথা মনে পড়লে গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে এখনো।

উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা থেকে

মনু নদীতে নৌকা বাইচ

কয়েছ আহমেদ

আমাদের মৌলভীবাজার জেলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মনু নদী। সে নদীতে প্রতি বছর আষাঢ় মাসে নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হতো। প্রথম পুরস্কার থাকতো রঙিন টেলিভিশন। লোকাল ছাড়াও অন্যান্য জেলা থেকে নৌকা আসতো। লোকালের মধ্যে *অন্তহরি*-র নৌকা খুব জনপ্রিয় ছিল। কথিত আছে, অন্তহরি গ্রামের অনুকূল ঠাকুর শুকনো মরসুমে একটি নৌকা তৈরি করেছিলেন। তার গ্রামের লোকজন ভাবলো, অনুকূল ঠাকুর পাগল হয়ে গেছেন।

অনুকূল ঠাকুরের নৌকা তৈরি শেষ হলো। তিনি তার কয়েকজন লোকের হাতে বৈঠা তুলে দিলেন।

লোকজন নৌকায় উঠলো।

অনুকূল ঠাকুর বললেন, বৈঠা মারো।

লোকজন মাঠের মধ্যে থাকা নৌকায় বৈঠা মারতে শুরু করলো।

সবার সঙ্গে নৌকায় বসে অনুকূল ঠাকুর বৈঠা হাতে নিয়ে বললেন, বল হরি হরি, নৌকা যায় অন্তহরি।

অবাক কাণ্ড! সেদিন নৌকা পানি ছাড়া মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়েছিল। এ জন্য মনু নদীতে নৌকা বাইচ প্রতেযাগিতায় অন্তহরি-র নৌকা বেশ জনপ্রিয়।

তারপর আছে বেটির নৌকা। বড়কাপন গ্রামে একজন মহিলা আছেন। তার নাম খুব কম লোকই জানেন। তার স্বামী বিদেশ থাকেন। সে মহিলা স্বামীর টাকা দিয়ে নৌকা বাইচের জন্য নৌকা বানিয়েছিলেন। দুই চার জায়গায় সে নৌকা প্রথমও হয়েছিল। যেহেতু মালিক মহিলা, তাই নৌকার নাম হয়েছিল *বেটির নৌকা।*

মনে পড়ে ১৯৯৯ সাল। বাংলা আষাঢ় মাস। নৌকা বাইচের কয়েকদিন আগে থেকে মাইকিং হয়েছিল। বলা হয়েছিল, দুইটার সময় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তবে সবাই জানে, বাংলাদেশে কোনো জিনিসই ঠিক সময় মতো হয় না।

দূরদূরান্ত থেকে লোকজন দুটার আগেই আসতে লাগলো। দুটার আগে মনু নদীর দুই তীর লোকে লোকরণ্য হয়ে গেল। মনু নদীর দুই তীর ঘেষে অনেক বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে। সে সব বিল্ডিংয়ের ছাদেও বেশ লোকজন জমা হয়েছে।

মনু বৃজের ওপর দিয়ে যে রিকশা যাবে সে ক্ষমতা নেই। রিকশা যেতে হলে বেল বাজানোর পর ড্রাইভার রিকশা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রিকশা ড্রাইভাররা বিরক্ত হলেও এদিন নৌকা বাইচ এ জন্য সব মেনে নিয়ে রিকশা টেনে নিয়ে যায়। শুধু ট্রাক, টেম্পো এলে ড্রাইভারের উদ্দেশে আর সময় পেলি না! বলে দর্শকরা যথাসম্ভব জায়গা করে দিচ্ছে।

মনু বৃজের নিচে গিয়েছিলাম। আমার পাশে লিপনমামু। যেসব নৌকা প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে সেসব নৌকা দর্শকদের দেখানোর জন্য মাঝি-মাল্লাসহ নৌকা একবার করে দেখা দিয়ে যাচ্ছে।

দুইটি ইঞ্জিনের নৌকা রয়েছে। একটিতে পৌরসভার কমিশনার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আতিকুল হক চৌধুরী রয়েছেন। তিনি বাশি বাজিয়ে এ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবেন। দ্বিতীয় ইঞ্জিন নৌকায় ভিডিও ক্যামেরাসহ ক্যামেরাম্যান রয়েছে।

হঠাৎ লিপনমামু বললো, ওই ইঞ্জিনের নৌকায় চল। তাহলে নৌকা বাইচটা ঠিক মতো দেখা যাবে।

তাকে বললাম, ইঞ্জিনের নৌকায় উঠবো কিভাবে? ওটাতে উঠতে দেবে না।

প্রায় আমার বয়সী লিপন মামু বললো, আরে, ওই নৌকাতে দেখ কে ক্যামেরা ধরছে?

লিপনমামুর কথায় দ্বিতীয় ইঞ্জিন নৌকার দিকে তাকলাম। দেখলাম ভিডিও ক্যামেরা হাতে নিয়ে শামীম রয়েছে। শামীর আর আমি স্কুল জীবন থেকে শুরু করে এইচএসসি পর্যন্ত এক সঙ্গে ছিলাম। শামীম এরপর কলেজে যায়নি। সে ভিডিওর দোকান দিয়েছিল। সে দোকানে ভিডিও ক্যাসেট, ডিভিডি ভাড়া দেয়। ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে বিয়ে, জন্মবার্ষিকী, শিরনির অনুষ্ঠান রেকর্ডিং করে। বিনিময়ে টাকা নেয়। প্রফেশনাল।

শামীমকে ডাক দিলাম। এই কোলাহলের মধ্যে ও শুনতে পেল না। যদিও ইঞ্জিনের নৌকাটি তীরের কাছেই ভেড়ানো আছে। অবশেষে ছোট্ট একটি পাথর তুলে ঢিল মারলাম নৌকার ছাদে। তারপর এদিকে শামীম তাকানো মাত্র হাত নাড়তে লাগলাম। চিৎকার করে বললাম, তাদের নৌকায় উঠতে চাই।

শামীম নৌকার মাঝিকে কি যেন বললো।

নৌকা ভেড়ানোর পর আমি ও লিপনমামু নৌকায় উঠলাম।

বিকাল প্রায় সাড়ে তিনটার দিকে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা শুরু হলো। মোট বারোটি নৌকা এসেছে। প্রথমে তিনটি করে দৌড় দেবে। প্রতি দৌড় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করা নৌকাটিকে মূল পর্বের জন্য রাখা হবে। ফাইনাল দৌড়ে চারটি নৌকা প্রতিযোগিতা করবে।

প্রথম দৌড়ে অংশ নিল তিনটি নৌকা। প্রথমে ভাবলাম রূপ মিয়ার নৌকা পেছনে পড়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিম বাজারস্থ বাক-এ গিয়ে দেখা গেল রূপ মিয়ার নৌকা অন্য নৌকার চেয়ে প্রায় দশ বারো হাত এগিয়ে।

চারপাশের লোকজন উৎসাহে চিৎকার করছে। শান্তিবাগের পশ্চিম দিকে কিছু বিল্ডিং প্রায় নদীর ওপরই তৈরি হয়েছিল। এসব বিল্ডিং যে কে তৈরি করেছিল জানি না। এখন এগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। লোকজন এসব পরিত্যক্ত বিল্ডিংয়ের ওপর উঠে প্রতিযোগিতা দেখে লাফাচ্ছে। নদী থেকে দেখে ভেবেছিলাম, এসব পুরনো বিল্ডিংগুলো ভেঙে ফেলা হচ্ছে না কেন? যদি এতো সব লোকজনের ওজন ছাদ সহ্য করতে না পারে, তখন কি হবে?

দ্বিতীয় দৌড় শুরু হলো। অন্তহরি-র নৌকা ও বেটির নৌকা খুব কাছাকাছি। খুব খারাপ লাগলো এই ভেবে যে, এই বাইচে অন্তহরি বা বেটির নৌকা এ দুই নৌকার একটি চূড়ান্ত দৌড়ের জন্য নেয়া হবে।

বাইচের নৌকা বেশ এগিয়ে গেছে। ইঞ্জিনের নৌকায় ঢেউয়ের দোলা লাগছে।

শামীম ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করছে।

শান্তিবাগের বাকটা পার হলাম। হঠাৎ চিৎকার। সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম পুরনো ওই সব বিল্ডিংয়ের মধ্যে একটির ছাদ ভেড়ে পড়েছে।

শামীম তার ক্যামেরা সেদিকে তাক করেছে।

লোকজন চিৎকার করছে।

নদীতে যথেষ্ট স্রোত। প্রথমেই ভাবলাম এই ছাদে কি কোনো বাচ্চা বা বৃদ্ধ লোক ছিল? তারা এই স্রোতে সাতার কাটতে পারবে কি না সন্দেহ আছে।

বাইচের নৌকা ওদিকে চলে যাচ্ছে। সঙ্গত কারণে ইঞ্জিনের নৌকা ওদিকে চললো।

এ দৌড় শেষ হওয়ার পর আবার ফেরত এলাম। সে জায়গায় এসে দেখলাম এই বিল্ডিংয়ের আশপাশ থেকে নেমে লোকজন নদীর দিকে উকি মারছে। ততোক্ষণে নাকি সাতজন লোক তীরে উঠেছে। দুই তিনজন নিখোজ।

একজন কেদে কেদে বললো, তার পাশে তার ছেলে ছিল। এখন তাকে পাচ্ছে না।

অ্যাম্বুলেন্স এসে লোকগুলোকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন খবর পেয়েছিলাম তখন পর্যন্ত দুইটি ছেলে নিখোজ রয়েছে।

সে বছর পর থেকে মনু নদীতে আর নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি। অথচ শামীমকে বলে রেখেছিলাম, ও যদি নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা রেকর্ড করে তাহলে আমাকে যেন আগের মতো সে ভ্রমণে নেয়।

কদমহাটা, মৌলভীবাজার থেকে

দিঘলী বিলে

- মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন সেন্টু

জীবনে প্রেম করেছি প্রায় শতাধিক। হিন্দু–মুসলমান, কৃশ্চিয়ান, এমনকি সুইপারের মেয়ের সঙ্গেও। অবশ্য নিজে থেকে কাউকে বলিনি যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি। চেহারা সুন্দর হওয়াতে অনেকেই প্রেম নিবেদন করতো। কাউকে ফিরিয়ে দেইনি। এমনকি আমার সিনিয়র কোনো আপাও যদি অফার করতো তাকেও ফিরিয়ে দেয়নি। চুটিয়ে প্রেম করতাম। বন্ধুরা আমার নাম দিয়েছিল *বিশ্ব প্রেমিক*। আমার প্রেম করার ধরন ছিল স্রেফ সময় কাটানোর জন্য। কাউকে মন থেকে কোনোদিন ভালোবাসিনি।

একদিন নিজের মনকে নিজেই ধিক্কার দিলাম, আমি বোধহয় কাজটা ভালো করছি না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম বিয়ে করবো। সিদ্ধান্ত এ জন্য নিলাম যে, বিয়ে করলে হয়তো আর এ রকম থাকবো না।

কিছু দিন পরের ঘটনা।

রাখী এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে তার বড় বোন।

রাখীকে আমার সিদ্ধান্তটা জানালাম। আগামী সাত দিনের মধ্যে তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তুমি যদি রাজি থাকো তাহলে বলো। যদি রাজি না থাকো তাহলে আর সম্পর্ক রাখার দরকার নেই।

আমার কথা শুনে দুই বোনই চমকে উঠলো।

রাখী বললো, বড় বোনের বিয়ে না হতেই আমি কিভাবে বিয়ে করবো?

ঠিক আছে। বিয়েটা আমরা গোপনে করবো। তোমার বোনের বিয়ের পর বিয়ের কথা জানানো হবে।

রাখী বললো, তবুও...।

ওর বড় বোন বললো, ঠিক আছে, ও রাজি, আপনি সব কিছু রেডি করুন।

বললাম, শুধু রাজি হলে হবে না, আপনাকে সাক্ষী হিসেবে থাকতে হবে।

তার বড় বোন রাজি হলো।

তাদেরকে ডেট দিলাম। সাত দিন পর।

তারা চলে গেল।

বাড়ি গিয়ে আমার ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু বিপ্লব ও হারুনকে ব্যাপারটা জানালাম। তারা দুজনই খুব খুশি। নির্ধারিত দিন কাজিসহ আরো পাচজন বন্ধু এলো। কথা ছিল প্রতিবেশী বোনজামাই রশিদের বাড়িতে বিয়ে হবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে হলো না। কারণ আমার প্রতিবেশী বোন বাধা হয়ে দাড়ালো। সে জেদ করলো, তাদের বাড়িতে বিয়ে হবে না। তার ভয় ছিল, আমার বাড়ি থেকে দোষারোপ করতে পারে।

চিন্তায় পড়লাম কি করা যায়?

এক বন্ধু বললো, দোস্ত, আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে। বিল তো ভরা। চল নৌকা ভাড়া করবো।

কাজি আমাদের বন্ধু হওয়াতে সুবিধা হলো। সবাই মিলে *তালতলি* নামের এক জায়গায় গেলাম যেখানে নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো নৌকা যেতে চাইছিল না। কারণ এতোগুলো ছেলের মাঝে দুজন মাত্র মেয়ে!

অনেক বোঝানোর পর একটা নৌকাওয়ালা রাজি হলো।

বিলের মধ্যে গিয়ে নৌকাওয়ালাকে বললাম, ভাই, সত্য কথা বলি। নৌকা ভাড়া করার একটাই কারণ। এখানে বিয়ে পড়ানো হবে। আপনি এখানে নৌকা বন্ধ করেন।

তারপর কাজি লেখালেখি শুরু করলেন।

বিলের পানিতেই আমরা দুজন অজু করে নামাজ পড়লাম, তারপর বিয়ে পড়ানো হলো।

আমরা যে বিলে বিয়ে করলাম সে বিলের নাম *দিঘলী বিল*। বিয়ে পড়ানোর পর ছেলেমেয়েকে পড়া শরবত খাওয়ানো হয়। তার পরিবর্তে বাদাম পড়া দিলেন মৌলভি। বিয়েটা অসুবিধার মধ্যে হলেও সেদিন খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। পরে অবশ্য আমাদের বিয়ে আবার পড়ানো হয়েছিল সামাজিকতা রক্ষার জন্য।

ফতেপুর, নওগা থেকে